বারমুডা ট্রায়াঙ্গল

চিরঞ্জীব সেন

বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশক
ভাদ্র ১৩৭১ সন
প্রকাশ
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯

যার কাছ থেকে বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের নাম আমি প্রথম শুনি ; আমেরিকা প্রবাসী এঞ্জিনিয়ার শ্রীমান বাসুদেব সরকারের হাতে এই বই আমি তুলে দিলাম।

চি. সে.

আটলান্টিক-ক্যারিবিয়ন সমুদ্র এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে প্রথমে জাহাজ ও পরে বিমান রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়ে আসছে। এ ছাড়া নানা-রকম অলৌকিক কান্ডও ঘটছে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। সমুদ্রের এই এলাকাটিকে আজকাল বলা হচ্ছে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল কিন্তু রহস্যজনক নিখোঁজ বা ঘটনাগুলি এই ত্রিকোণ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়, সীমানা আরও কিছু বিস্তৃত, এবং সেই বিস্তৃত এলাকেতেও নানা ঘটনা ঘটেছে।

১

দুশো, তিনশো বছর পূর্বে নাবিকেরা বলত রহস্য একটা আছে। বারমুডা কথাটা শুনলেই সেকালের সাদা দাড়িওয়ালা নাবিকেরা বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকত…

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল কী ?

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯।

নির্মেঘ অন্ধকার আকাশে রাশি রাশি তারা ঝিকমিক করছে। যেন আকাশে জরির কাজ করা নীল রঙের একটা বেনারসী সামিয়ানা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরিষ্কার আকাশ। মৃদু মৃদু হাওয়া বইছে। আকাশের কোনো কোনে বিপদের কোনো রকম আভাস নেই।

একখানা ডগলাস ডিসি-থ্রি, বিমান বাতাসে সাঁতার কাটতে কাটতে মিয়ামি এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিমানে রয়েছে পুয়েরটো রিকোব একদল যাত্রী। ওরা আমেরিকায় কাজকর্ম করে। বড়দিনের ছুটি কাটাতে দেশে গিয়েছিল, এখন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসছে। ছুটি ভালোই কেটেছে। সকলের মনে আনন্দ। শেষবারের মতো এয়ার হস্টেস মেরি বার্কস যাত্রীদের কুকি আর পাঞ্চ দিয়ে গেছে। ওরা এখন মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান গাইছে 'উই থ্রি, কিংস।'

আর একটু পরেই বিমান ল্যাণ্ড করবে। ককপিটে বিমানের ক্যাপটেন রবার্ট লিনকুইস্ট মাইক্রোফোনের সামনে মুখ রেখে বলতে লাগল :

'মিয়ামি টাওয়ার, দিস ইজ এয়ারবোর্ন ট্রান্সপোর্ট এন-ওয়ান সিক্স জিরো জিরো টু, ওভার'। মিয়ামি টাওয়ার এন ১৬০০২ নম্বর বিমান থেকে বলছি।

মিয়ামি টাওয়ার উত্তর দিলেন: 'এয়ারবোর্ন ট্রান্সপোর্ট এন ওয়ান সিক্স জিরো জিরো টু, দিস ইজ মিয়ামি টাওয়ার, গো অ্যাহেড।' মিয়ামি টাওয়ার বলছি। ঠিক আছে। বিমান নম্বর এন-১৬০০২ এগিয়ে এসো। ডিসি-থ্রি বিমানের ক্যাপটেন থামে নি। সে বলল :

'এন-১৬০০২ পুয়েরটো রিকোর স্যান জুয়ান থেকে মিয়ামির দিকে যাচ্ছে। আমরা এখন পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে উড়ছি, সব ঠিক আছে, মিয়ামি শহরের আলো দেখতে পাচ্ছি। ল্যাণ্ড করবার নির্দেশ দাও, বার্তা শেষ'।

মিয়ামি টাওয়ার উত্তর দিলো : 'জিরো জিরো টু, তোমরা এগিয়ে এসো, এয়ারপোর্ট দেখতে পেলে আমাদের বলবে'।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মিয়ামি টাওয়ার আবার বলল :

'জিরো জিরো টু, মিয়ামি টাওয়ার বলছি। উত্তর দাও'।

উত্তর নেই। বিমানের বেতার কি বিকল হলো নাকি ? আবার জিজ্ঞাসা করল :

'জিরো জিরো টু শুনতে পাচ্ছ' ?

তবুও উত্তর নেই। মিয়ামি টাওয়ার আবার বলল :

'এয়ারবোর্ন ট্রান্সপোর্ট এন-১৬০০২। মিয়ামি টাওয়ার বলছি। শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ ? উত্তর দাও'।

কিন্তু এন-১৬০০২ কিছু সংখ্যক যাত্রী বোঝাই সেই ডিসি-থ্রি বিমান কোনো উত্তরই দেয় নি। মিয়ামি টাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেককে সতর্ক করে দিয়েছিল। নিউ অরলিন্স এর স্থান জুয়ান ওভারসিজ রেডিও এবং আমেরিকার কোস্ট গার্ডদের রেডিও সঙ্গে সঙ্গে এন-১৬০০২ ডিসি-থ্রি বিমান খানির সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। কোনো সাড়া নেই।

আর দেরি নয়। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। চারদিকে বার্তা পাঠানো হলো। এয়ার বোর্ন ট্রান্সপোর্ট এন-১৬০০২ মিসিং, ডিসি-থ্রি বিমান নিখোঁজ। সমুদ্রের বুকে তখন অনেক জাহাজ ছিল, আকাশেও বিমান ছিল, অনুসন্ধানের জন্যে কিছু বিমান আকাশে উঠলো।

পরিষ্কার আবহাওয়া, শান্ত সমুদ্র, প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের খবর নেই।

দুর্ঘটনা ঘটলে বা ঘটবার উপক্রম হলে একটা এস ও এস বার্তা অন্তত শোনা যেত রেডিও যন্ত্র বিকল হয়ে গেলেও এতোক্ষণে বিমান মিয়ামি এয়ারপোর্টে পৌঁছে যেত। কিন্তু সেই ডিসি-থ্রি বিমানের কোনো খোঁজ নেই। পাইলট, কো-পাইলট এয়ার-হস্টেস এবং সাতাশ জন যাত্রী ও দু'জন শিশু সমেত সেই বিমান আজও নিখোঁজ। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে সমুদ্রের বুকে কোথাও কোনো ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। স্থান জুয়ান থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত সমুদ্র, গালফ অফ মেক্সিকো, ক্যারিবিয়ান, এভার-গ্লেড, ফ্লোরিডা বে, কিজ, কিউবা, হিসপ্যানিওলা এবং বাহামা ; সর্বত্র খোঁজা হলো। বিমানের কাঠের টুকরো, একটা লাইফ জ্যাকেট, তেলের টিন, মৃতদেহ, কিছুই পাওয়া গেল না। এই রহস্যের সমাধান আজও হয় নি।

ছ মাস পরে সিভিল এরোনটিকস বোর্ড রিপোর্ট দিলো : সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুব দিকে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের মাঝ বরাবর একটা অঞ্চলে অভূতপূর্ব ও রহস্যজনক অনেক ঘটনা ঘটেছে ও ঘটছে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, সে সব রহস্যের সমাধান হয় না।

উত্তরে বারমুডা থেকে দক্ষিণে পুয়েরটো রিকো এবং সেখান থেকে পশ্চিমে ফ্লোরিডা পার হয়ে গালফ অফ মেক্সিকোর কোনো এক বিন্দু এবং সেই বিন্দু থেকে আবার বারমুডা, এই তিনটি বিন্দু কাল্পনিক রেখা দিয়ে যুক্ত করলে যে ত্রিকোণ রচিত হবে তার নাম বারমুডা ট্র্যাঙ্গল। এই বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের মধ্যে হাল আমলে নয়, সেই আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে অনেক জাহাজ হারিয়ে গেছে। তারা কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না, তাদের আর দেখা যায় নি।

আগে হারিয়ে যেত জাহাজ, পরে ডুবোজাহাজও হারিয়েছে, হারিয়েছে অনেক বিমান। যাত্রীবাহী বিমান তো হারিয়েছেই এমন কি একত্রে একাধিক মিলিটারি বিমানও হারিয়েছে।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের বাইরেও এই রহস্যজনক ঘটনা ঘটছে, কাল্পনিক রেখা টানলে সেই ত্রিকোণ কখনও ঘুড়ির আকার নেবে কিংবা চতুকোণ।

বিমানের পাইলট বা জাহাজের ক্যাপটেনরা এই অঞ্চল যার নাম বারমুডা ট্র্যাঙ্গল, ডেভিলস ট্র্যাঙ্গল বা লিমবো অফ দি লস্ট, তারা এই 'হুডু সি' বা 'টুইলাইট জোন', সম্বন্ধে কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না, ভয় পায়। কে জানে সেই অচেনা ব্যক্তি তাদের ধ্বংসের জন্যে কোনো তুকতাক করে দেবে কি না।

অথচ এই অঞ্চলটা মরুভূমির মতো নির্জন নয়। প্রতিদিনই বহু সামরিক বা বেসামরিক জাহাজ এই সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করছে, কত বিমানও এর ওপর আকাশে উড়ছে।

এই এলাকার মধ্যে এই অভিশপ্ত ত্রিকোণের মধ্যেই রয়েছে ছুটি উপভোগের সুপরিচিত তিনটি স্থান, ফ্লোরিডা, বাহামা ও বারমুডা। ছুটি কাটাতে কত নরনারী তো সেখানে যাচ্ছে, যাচ্ছে কত প্রমোদ তরণী, বিলাসবহুল বিমান।

যে পরিমাণ জাহাজ বা বিমান রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছে তাদের সংখ্যা হয়তো কয়েক শত কিন্তু তারা যাচ্ছে কোথায়। জাহাজ ডুবলে বা বিমান দুর্ঘটনা ঘটলে তার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কোনো সূত্রই পাওয়া যায় না।

আমেরিকার কোস্টগার্ড-এর সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ ব্র্যাঞ্চের একজন মুখপাত্র বলেছে: সত্যি কথা বলতে কি, এই যে যার নাম বারমুডা ট্র্যাঙ্গল, এর ভেতরে যে কি ঘটছে তা আমরা জানি না। যে সব জাহাজ হারিয়ে গেছে তারা কিভাবে হারিয়ে গেল বলতে পারব না শুধু অনুমান করতে পারি মাত্র।

তবে কি এই সমুদ্রের গভীরে কোথাও আগ্নেয়গিরি আছে? সেই আগ্নেয়গিরি যখন জেগে ওঠে তখন সে পুরো একটা জাহাজকে গিলে ফেলে?

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল কি এমন একটা অঞ্চল যেখানে কোনো অজানা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, বেতার, কম্পাস বা অন্য সব যন্ত্র বিকল করে দেয়?

নাকি কোনো টরনাডো ফানেল মাঝে মাঝে আকাশ থেকে নেমে এসে জাহাজগুলোকে তুলে নেয় এবং বিমানগুলোকে স্রেফ গিলে ফেলে?

এমনও কি হতে পারে যে হঠাৎ কোথাও এক বিরাট অগ্নিপিণ্ড সৃষ্টি হয়ে সামনে যা পেল তা পুড়িয়ে ছারখার করে দিলো?

দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ এই তিন ডাইমেনশনের কথা আমরা জানি কিন্তু একটি চতুর্থ ডাইমেনশন আছে, যাকে আইনস্টাইন বলেছেন টাইম বা কাল। এই কালের কোনো প্রভাব বা নিয়মবহির্ভূত কিছু শক্তি কাজ করছে নাকি? যেজন্যে এই সব জাহাজ বা বিমান অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে?

আবার কেউ কেউ বলেছেন গ্রহান্তরের জীব এবং সমুদ্রতলে নিহিত অজানা কোনো সভ্যতার অদৃশ্য হাত কাজ করছে?

প্রাচীন কালের কথা বাদ দিলেও হাল আমলেই এই রহস্যময় ত্রিকোণে এক হাজার ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, জেট প্লেন সমেত একশ হাজার নিখোঁজ হয়েছে, কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই সকল মৃত্যু ও নিরুদ্দেশের কারণ দৃশ্যমান দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়।

মাঝে মাঝে বিস্ময়কর সব ঘটনা ঘটে, সবুজ রঙের উজ্জ্বল কুয়াশায় সমুদ্র ঢাকা পড়ে, অদ্ভুতদর্শন জলস্তম্ভ দেখা যায়, সমুদ্রের বুকে হঠাৎই সৃষ্টি হয় বিরাট ঘূর্ণিজলের, বিরাট বিরাট সাদা ঢেউ হিংস্রভাবে জাহাজ গিলতে আসে। এছাড়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেন মাঝে মাঝে নিয়ম মেনে চলে না, কম্পাসের কাঁটা যেন পাগল হয়ে যায়। বেতার যন্ত্র আর রাডার বিকল হয়ে যায়। কেন এমন হয়, এর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই ত্রিকোণের ওপরের আকাশকে বৈমানিকেরা বলে 'স্কাই ট্র্যাপ'। পৃথিবীতে দুটি অঞ্চল আছে যেখানে কম্পাসের কাঁটা সর্বদা সঠিক উত্তর দিক নির্দেশ করে। অথচ এই দুটি অঞ্চলেই বিমানের পাইলট বা জাহাজের ক্যাপটেন দিকভ্রষ্ট হয়ে যায়। একটি অঞ্চল হলো এই বারমুডা ট্র্যাঙ্গল আর অপরটি হলো জাপানের দক্ষিণ দিকের সমুদ্র যার নাম দেওয়া হয়েছে ডেভিলস সি, শয়তান সাগর। এখানেও রহস্যজনক ভাবে জাহাজ বেপাত্তা হয়ে যায় তবে সংখ্যায় বেশি নয়।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল তাহলে কি? সভ্য মানুষের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ? তাই হবে

বোধহয় !

রেডিও, টেলিভিসন, সাময়িক পত্রিকা ও খবরের কাগজের পাতায় যতই আলোচনা হচ্ছে রহস্য যেন ততই ঘন হচ্ছে। কেউ কেউ এই রহস্যকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে তাকে জটিল করেছেন। কেউ সমাধানের চেষ্টায় অনুমান করেছেন মাত্র, গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারেন নি।

তর্কবিতর্ক ও আলোচনার ঝড় বয়ে চলেছে, আর সেই রহস্যময় ত্রিকোণে হাজার হাজার লোক মরেছে, শতেক জাহাজ, শতেক বিমান, কিছু ডুবোজাহাজও বিস্ময়কর ভাবে নিরুদ্দিষ্ট। তারা কোথায় গেছে কেউ জানে না। সোজা কথায় এই হলো বারমুডা ট্র্যাঙ্গল।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল নামটা এলো কোথা থেকে ? সঠিক কোনো উত্তর মেলে নি। তবে নামটা বেশি পুরনো নয়। ১৯৪০ সাল নাগাদ কয়েকটা বিমান ঐ অঞ্চলে নিখোঁজ হয়েছিল তখন কোনো একটি খবরের কাগজ অঞ্চলটির বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে 'বারমুডা ট্র্যাঙ্গল' শব্দটি ব্যবহার করেন। সেই থেকেই বারমুডা ট্র্যাঙ্গল নাম চালু হয়ে গেল।

নামটা যদিও নতুন, রজত জয়ন্তী পার হলেও সুবর্ণ জয়ন্তী হতে এখনও দেরি আছে তথাপি কতকগুলি রহস্য বেশ কয়েকটা শতবার্ষিকী সম্পূর্ণ করেছে। আমেরিকার আর এক নাম নিউ ওয়ার্ল্ড। সেই নতুন পৃথিবীর দিকে সমুদ্রে পাড়ি দেবার সময় থেকেই রহস্য। বারমুডা দ্বীপ, উত্তর আমেরিকা, কিউবা, হেইটি, পুয়েরটো রিকো-র উপকূলে সমুদ্রের সাদা ফেনা সেদিন থেকে আজও আছাড় খেয়ে পড়ছে কিন্তু তারা যে রহস্য বহন করে আসছে তার উত্তর জানিয়ে দিচ্ছে না।

তাহলে সত্যিই কি ওখানে একটা রহস্য আছে ?

একশো, দুশো তিনশো বছর আগেকার মানুষরাও বলতো রহস্য একটা আছে। নাম শুনেই সেকালের সাদা দাড়িওয়ালা নাবিকেরা বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকত ডান হাতের তর্জনী দিয়ে।

পুরনো পুঁথিপত্তর ঘাঁটলে জানা যায় যে সেকালের সেই সাদা দাড়িওয়ালা নাবিকেরা বারমুডা দ্বীপকে বলত 'আইলস অফ দি ডেভিলস', শয়তানের দ্বীপাবলি।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের ভেতরে প্রথম কে ঢুকেছিল ? তার নামটি কি জানা যায় ? সে কি কোনো রহস্যের সন্ধান দিয়েছিল ?

হ্যাঁ। নাম সবাই জানে। তার নাম ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও তার নাবিকেরা ভৌতিক কিছু দেখে ভয় পেয়েছিল। বিরাট একটা অগ্নি-গোলকের উল্লেখ করেছে কলম্বাস। একদিন রাত্রে যখন কলম্বাস ও তার নাবিকেরা সভয়ে দেখল বিরাট একটা অগ্নি-

গোলক দূরে সমুদ্রের বুকে পড়ে বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

তবে এই অগ্নিগোলক ওরা একবারই দেখেছিল। কিন্তু কম্পাসের ব্যাপারটা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দিনে যখন সূর্য বা রাত্রির পরিষ্কার আকাশে ধ্রুবতারা যখন নির্ভুলভাবে দিক চিনিয়ে দিচ্ছে তখন কেন কম্পাস উত্তর দিক সঠিক ভাবে দেখাবে না?

সমুদ্রের ঐ অঞ্চলের কোনো কোনো এলাকায় কম্পাসের কাঁটা আজও সরে যায়। কম্পাস যেন পাগল হয়ে যায়। রাত্রে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে কিংবা ঘন কুয়াশা চারিদিক আবৃত করলে কম্পাস দেখে দিক নির্ণয় করা যায় না। জাহাজ বা বিমান ভুল পথে আজও চলে যায়।

খ্যাতনামা ও অভিজ্ঞ সেই নাবিকটি বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্যের খবর জানিয়ে গেছে।

প্রায় পাঁচশো বছর আগে ১৪৯২ সালে ক্যানারি আইল্যাণ্ড থেকে তিনটি জাহাজ নিয়ে ভারত আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে কলম্বাস যখন পাড়ি দিয়েছিলেন তখন যে সামনে কি আছে, কতদূর যেতে হবে, কত সময় লাগবে, কলম্বাস বা তার নাবিকেরা কিছুই জানত না।

জলজ উদ্ভিদ ভর্তি সমুদ্র সারগাসো সি-এর খবরই বা কে জানত? এও তো সমুদ্রের মধ্যে একটি রহস্যময় ও বিপজ্জনক সমুদ্র। উত্তর আটলান্টিকের ভেতরে প্রায় দু হাজার মাইল দীর্ঘ ও হাজার মাইল প্রস্থ এই সমুদ্র যার নাম সারগাসো সি। নামটি এসেছে পার্তুগীজ কথা 'সারগাকো' থেকে যার অর্থ সামুদ্রিক আগাছা। এই সমুদ্র ঘিরে ঘড়ির কাঁটার গতিপথ ধরে মৃদু গতিতে বৃত্তাকার স্রোত বইতে থাকে নিরন্তর।

শুধু জলজ উদ্ভিদ নয়, নানা রকমের বড় কীট, সরীসৃপ ও জলজ প্রাণী এই সমুদ্রের বাসিন্দা। এই সব উদ্ভিদ ও প্রাণী পৃথিবীর অন্যত্র দেখা যায় না। বড়ই রহস্যময় তাদের প্রকৃতি। এই সমুদ্রের খানিকটা অংশ বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

সারগাসো সমুদ্রে জাহাজ যখন ঢুকে পড়ে তখন মনে হয় ভূখণ্ড বুঝি খুব কাছেই। কলম্বাসের নাবিকদের তাই মনে হয়েছিল। জলজ উদ্ভিদ দেখে মনে হয় সমুদ্র বুঝি অগভীর কিন্তু তা নয়, সমুদ্র এখানে কয়েক মাইল গভীর।

জায়গায় জায়গায় এই সমুদ্র আবার অত্যন্ত বিপজ্জনক। পালতোলা জাহাজ মাঝে মাঝে আটকে যেত। আর সেই সব জলজ উদ্ভিদের প্রকৃতি এমন যে সেই গাছ জাহাজকে যেন আক্রমণ করত। জাহাজের গায়ে সেই গাছ জন্মাত, তার লতানো শাখা প্রশাখা অচিরে জাহাজকে আবৃত করত।

এ তো শুধু গাছ। বিপদ ছিল বড় বড় কীট ও কিলবিলে সরীসৃপ থেকে। সেই কীট জাহাজের কাঠ ও পাল খেয়ে জাহাজখানা ঝাঁঝরা করে দিত আর সেই সরীসৃপ, মানুষের রক্ত খেয়ে ফেলত। এইভাবে কত জাহাজ সারগাসো সমুদ্রে ধ্বংস হয়ে গেছে।

আজকাল আবার একটা হাওয়া উঠেছে। এই সারগাসো সাগরের তলাতেই ছিল আটলান্টিস মহাদেশ। সেই মহাদেশ আবার জেগে উঠছে। কেউ কেউ বলছে তা নয়, সেই আটলান্টিস মহাদেশ এখন সমুদ্রের অজানা গভীরে নতুন সভ্যতার গোড়া-পত্তন করেছে। তারাই জাহাজগুলিকে গ্রাস করছে।

বিপদ শুধু সারগাসো সাগর নয়। বিপদ এর উত্তরে আছে ৩০ ও ৩৫ ল্যাটিচিউডের মধ্যে হর্স ল্যাটিচিউডে। এই নাম ছেলেরা ভূগোল বইতে পড়েছে।

এই বিস্তৃত এলাকায় হাওয়া নিশ্চল, মোমবাতি জ্বাললে তার শিখা কাঁপে না। জাহাজের খোলা ডেকে মোমবাতি জ্বালিয়েই বই পড়া যায়। এই হর্স ল্যাটিচিউডে বাতাসের অভাবে কত পালতোলা জাহাজ যে নষ্ট হয়েছে। বাতাস না বইলে পালতোলা জাহাজ এক ফুটও এগোবে না। এ তো নৌকো নয় যে দাঁড় টেনে পার হওয়া গেল।

জাহাজে ভর্তি করে ঘোড়া চালান দেওয়া হতো। ঘোড়াভর্তি সেই পালতোলা জাহাজ বায়ুহীন সমুদ্রে আটকে যেত। বাতাসের অভাবে জাহাজ চলছে না। পানীয় জল ক্রমশ কমে আসছে। বৃষ্টিও নেই। পানীয় জল রক্ষার জন্য রুগ্ন ঘোড়াগুলি জলে ফেলে দেওয়া হতো। অনেক সময় তৃষ্ণার্ত ঘোড়া ছুটে গিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিত আর উঠত না। সেই সব ঘোড়া নাকি মরে ভূত হয়ে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, গভীর অন্ধকার রাত্রে।

সে যুগে মানুষ গভীর ভাবে কুসংস্কারে বিশ্বাস করত। তখন থেকে এই সব কাহিনী মানুষ শুনে আসছে। তবে সবটাই কুসংস্কার নয়। যে রকম উল্লেখ করা হলো সেরকম অনেক ঘটনাই সত্য তবে অতিরঞ্জন মাঝে মাঝে আছে। যেমন কোনো নাবিক হয়তো বললো যে সে এতোবড় অক্টোপাস বা স্কুইড দেখেছে যারা একটা জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে।

কলম্বাসের নাবিকেরা আতঙ্কগ্রস্ত। তারা যেন এক মরা-রাজ্যে প্রবেশ করেছে। মাঝে মাঝে দেখা যায় আকাশে পাখি উড়ছে, সমুদ্রের জলে গাছের ডাল ভেসে যাচ্ছে কিন্তু মাটির দেখা নেই।

রাত্রে যেন তাদের পাশ দিয়ে কারা চলে যায়, তাদের কানে কানে ফিসফিস করে কি কথা বলে। কলম্বাস তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কোন্ মায়া-রাজ্যে? সেখানে

কি মানুষখেকোরা থাকে ?

ওরা কলম্বাসকে তিন দিন সময় দিল। তিন দিনের মধ্যে মাটি দেখা না দিলে জাহাজ ফেরাতে হবে। মসলার দেশ হিন্দোস্তান বলে কিছু নেই।

পরদিন রাত্রি দশটার সময় দূরে যেন আলো দেখা যাচ্ছে ? কলম্বাস দেখলেন, দূরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। বিশ্বাস হলো না। কলম্বাস একজনকে ডাকলেন! সেও আলো দেখতে পেল। তারপর আরও একজনকে ডাকলেন। কোথায় আলো ? সে কিছুই দেখতে পেল না। তবে কি কলম্বাস হেরে যাবে ?

পরদিন 'পিণ্টা' জাহাজ থেকে রডরিগো ডি ট্রিয়ানা জানাল যে সামনে ল্যাণ্ড দেখা গেছে।

তাহলে গত রাত্রে তারা ঠিকই দেখেছিল। সত্যিই আলো দেখেছিল, ভৌতিক কোনো ব্যাপার নয়।

কলম্বাস বেঁচে গেলেন। তাঁকে আর লাঞ্ছিত হতে হলো না কিন্তু সেই থেকে রহস্যের আরম্ভ। ওখানে কিছু আছে। সারা পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানী এবং অবিজ্ঞানীরাও সেই রহস্যের উৎস খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এখনও উত্তর পাওয়া যায় নি। ইংলণ্ড তো তিনশ বছর আগে থেকেই মাথা ঘামাচ্ছে। ইংলণ্ডের জাহাজী ইতিহাসে লয়েডস অফ লণ্ডন একটা বিরাট নাম। সেই ১৬০০ সালের শেষের দিকে লয়েডস সোরগোল তুলেছিল। মধ্য আটলান্টিকে এত জাহাজ যাচ্ছে কোথায় ? সারা পৃথিবীতে যত জাহাজ নষ্ট হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি জাহাজ এই মধ্য আটলান্টিকে হারাচ্ছে। তারা যে কোথায় যাচ্ছে তার কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

সে যুগটা ছিল জলদস্যুদের যুগ। মেকসিকো ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মূল্যবান সামগ্রী বোঝাই জাহাজ আসত স্পেনের দিকে। সেই সব জাহাজ তখন লুট করবার মতলবে থাকত পাইরেটরা। তাদের আক্রমণে অনেক জাহাজ ধ্বংস হতো। জলদস্যুরা জাহাজ ডুবিয়ে দিত, জ্বালিয়ে দিত বা জাহাজের নাবিকদের হত্যা করে সব কিছু লুটপাট করে জাহাজখানা জলে ছেড়ে দিত।

তবুও এই সব জাহাজের একটা কিনারা হতো, বোঝা যেত জলদস্যুর আক্রমণে জাহাজ ধ্বংস হয়েছে কিন্তু অনেক জাহাজের কোনো পাত্তা পাওয়া যেত না। তাদের ভাগ্যে কি ঘটল কিছু অনুমান করা যেত না। তাহলে জলদস্যু এবং প্রলয় ব্যতীত আরও কিছু ছিল।

বারমুডা ট্রাঙ্গেলের ভেতর শ' তিনেক প্রবাল দ্বীপ আছে কিন্তু তার মধ্যে মাত্র কুড়িটিতে জনবসতি আছে। সেই চার পাঁচ'শ বছর আগেই মানুষের মনে ভয় ঢুকে গেছে। ঐ সব শয়তানের দ্বীপগুলিতে ওরা বাস করতে চায় না। নাবিকরাও দ্বীপ-

গুলি এড়িয়ে চলত। নাবিকেরা বলত ঐ দ্বীপগুলি শয়তানের ক্রীড়াভূমি। দিনের বেলাতেই ভয় পায়, রাত্রে তো কথা নেই। অথচ এই সব নাবিকেরা ছিল দুঃসাহসী। বিপদ-সংকুল সমুদ্রে জীবন বিপন্ন করে মাসের পর মাস তারা ঘুরে বেড়াত।

জুয়ান ডি বারমুডেজ নামে স্পেন দেশের একজন অভিযাত্রী ১৫১৫ সালে বারমুডা দ্বীপটি আবিষ্কার করে কিন্তু সেই দ্বীপ কেউ দখল করে নি। কেউ সেই দ্বীপে বাস করতেও চায় নি।

কেউ হয়তো বাস করতও না যদি একশ বছর পরে 'সি ভেঞ্চার' নামে একখানা ব্রিটিশ জাহাজ ঝড়ের আক্রমণে ঐ দ্বীপের উপকূলে আছড়ে না পড়ত।

জাহাজটি একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেটি জলে ভাসাবার আর কোনো উপায় ছিল না। জাহাজে ছিল একদল ইংরেজ যাত্রী। ওরা যাচ্ছিল আমেরিকার সদ্য স্থাপিত ভারজিনিয়া কলোনিতে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে। ভারজিনিয়াতে পৌঁছবার আগেই এই বিপদ।

শয়তানের এই দ্বীপে কেউ থাকতে চায় না অথচ উপায় তো নেই। নেতা ছিলেন স্যার জর্জ সোমার্স। তিনি নিজে খুব সাহসী ছিলেন, ভূত বা কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন না। যাত্রীদের তিনি সাহস দিতে থাকলেন। ভাঙা জাহাজে ওরা চারদিন কাটাল। জোয়ারের টানে জাহাজখানা একটা খাঁড়ির ভেতর ঢুকে গেল। সেখানে এমনভাবে আটকে গেল যে জাহাজ থেকে না নেমে আর উপায় নেই। জাহাজে বৃথা বন্দী থেকে লাভ কি? ক্ষিধে তেষ্টায় মরতে হবে যে!

স্যার জর্জ প্রতিটি যাত্রীকে বারমুডেজ আবিষ্কৃত সেই দ্বীপে নামিয়ে দিলেন এবং জাহাজের সমস্ত মালপত্রও। ভাগ্যিস ওরা জাহাজ থেকে নেমে পড়েছিল কারণ কিছু পরেই আবার জোয়ারের টানে জাহাজখানা ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে গেল।

ভারজিনিয়ার একজন ডুবুরি এডমাণ্ড ডাউনিং এবং বারমুডার একজন ডুবুরি টেডি টাকার দু'জনে ১৯৫৮ সালে ফোর্ট সেণ্ট ক্যাথারিন থেকে কিছুদূরে সমুদ্রগর্ভে 'সি ভেঞ্চার' জাহাজের কংকাল ও কিছু ভাঙাচোরা অংশের সন্ধান পেয়েছিল।

এর দ্বারা প্রমাণ হলো যে সতেরো শতাব্দীর সেই জাহাজডুবির ঘটনা সত্য, অলীক কাহিনী নয়।

যাত্রী ও নাবিকেরা জাহাজ থেকে নামল বটে কিন্তু স্যার জর্জ এবং জাহাজের ক্যাপটেন নিউপোর্ট দ্বীপের নামটা গোপন রেখেছিলেন।

দ্বীপে নামবার পর ভীত যাত্রীদের কিন্তু দ্বীপটা খারাপ লাগল না। আবহাওয়া চমৎকার, ইংলণ্ডের চেয়ে শতগুণে ভালো, খাদ্যও প্রচুর। সমুদ্রের মাছ, গলদা চিংড়ি,

কাঁকড়া ও কচ্ছপ অতি সুস্বাদু। জঙ্গলে বন্য শূকরও প্রচুর, নানারকম ফলও আছে গাছে গাছে। জমিও বোধহয় অনুর্বর নয়।

সি ভেঞ্চার এর ধ্বংস কাহিনীকে উপলক্ষ্য করে উইলিয়ম শেক্সপিয়ার তাঁর নাটক লিখলেন 'দি টেমপেস্ট'।

তিন বছরের মধ্যে বারমুডা গ্রেট ব্রিটেনের কলোনি হয়ে গেল। অভিযাত্রীরা স্থির করল তারা এই দ্বীপেই থেকে যাবে। তারা কুঁড়ে ঘর বাঁধতে লাগল।

স্যার জর্জ সোমার্স ডায়েরি রাখতেন। 'সি ভেঞ্চার' জাহাজ ধ্বংস হবার আগে তিনি তাঁর ডায়েরিতে একটি অলৌকিক ঘটনা লিখেছেন। ঘটনাটির কথা তিনি কাউকে বলেন নি। তাহলে ভয় ছিল নাবিকেরা বিদ্রোহ করতে পারে।

একদিন রাত্রে জাহাজের কোয়ার্টার ডেকে তিনি পাহারা দিচ্ছিলেন। শান্ত সমুদ্র। বাতাস বইছে। অন্ধকার। ওক কাঠের রেলিঙে তিনি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জাহাজ চলতে চলতে বোধহয় অশান্ত সমুদ্রে পড়ল। এখানে বড় বড় ঢেউ। ঢেউয়ের ওপর জাহাজ নাচতে লাগল। আকাশে মেঘের সঞ্চার হলো। তারার ঝিকিমিকি নিবে গেল। ঘন অন্ধকারে সবদিক ভরে গেল। সমুদ্র তরঙ্গের শব্দ, জাহাজের পালের ও দড়ির আওয়াজ সোমার্সকান পেতে শুনতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ও কি দেখছেন? সমুদ্রে কোনো মাছ নিজস্ব আলো জ্বালিয়ে শিকার ধরে। কিন্তু এ তো সে রকম কোনো আলো নয়?

এ আলোটা যেন ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নেচে চলেছে। ঢেউয়ের মাথার ওপর নাচতে নাচতে আলোটা যেন জাহাজের ডেকে উঠে এলো তারপর দড়ি বেয়ে পালে উঠে বাতাসে স্ফীত পালের ওপর লাফাতে লাগল।

লাফাতে লাফাতে সেই আলো বড় মাস্তুলটার ওপর উঠে গেল তারপরই নেমে এলো। নিজেকে যেন গুটিয়ে নিল, দূর আকাশের নীল তারার মতো। তারপর আস্তে আস্তে বড হতে হতে আকাশে লাফিয়ে উঠে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

না। তিনি স্বপ্ন দেখেন নি। জেগেই ছিলেন। সোমার্সের ডায়েরির এই ঘটনা শেক্সপিয়র অমর করে রেখেছেন তাঁর টেমপেস্ট নাটকে। সেই এরিয়েল যে নৃত্যচঞ্চল আলোর শিখার মতো রাজার জাহাজে উঠে আসে, ঘুরে বেড়ায় জাহাজের এখানে ওখানে।

আরও একটি ঘটনা। জাহাজে আরও একজন লোক ছিলেন, ভারজিনিয়া কলোনির জন্য নিযুক্ত সেক্রেটারি, উইলিয়ম স্ট্রেচি। তিনি ঐ ঘটনার কথা লিখেছেন।

'সি ভেঞ্চার' জাহাজ থেকে একটা লম্বা বোট জাহাজখানা ডোববার আগেই উদ্ধার করা হয়েছিল। এই লম্বা বোট ও লাইফ বোটে চেপে যাত্রীরা ভাঙা জাহাজ থেকে

বারমুডা দ্বীপে অবতরণ করেছিল।

ওরা জানত আমেরিকান মূল ভূখণ্ড বেশি দূরে নয়। কিছু সরবরাহ আনা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সেই লম্বা বোটে পানীয় জল ও রসদ ভরে সাত জন সাহসী নাবিক সঙ্গে নিয়ে হেনরি র‍্যাভেনস একটি পাল খাটিয়ে যাত্রা করল।

তারিখটা ২৮ অগস্ট। 'সি ভেঞ্চার' ধ্বংস হবার ঠিক একমাস পরে। দ্বীপের বাকি নতুন অধিবাসীরা সমুদ্রের ধারে এসে হেনরি র‍্যাভেনস ও তার সাতজন সঙ্গীকে 'ফেয়ার-ই-ওয়েল' বলে বিদায় জানাল।

র‍্যাভেনস নৌকা ছেড়ে দিলো। দ্বীপবাসীরা নিজের নিজের কুটিরে ফিরে এলো। তারা ভাবতে লাগল র‍্যাভেনস ভারজিনিয়াতে পৌঁছলে সকলে জানতে পারবে সি ভেঞ্চারের যাত্রীরা প্রাণে বেঁচে গেছে। তারা অন্য এক দ্বীপে নেমেছে এবং ভালোই আছে। সি ভেঞ্চারের সঙ্গে আরও একখানা জাহাজ ভারজিনিয়া যাত্রা করেছিল। সে জাহাজ এতদিনে ভারজিনিয়া পৌঁছে গেছে এবং যাত্রীরা হয়তো ভেঞ্চারের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়েছে। যাক, এবার তারা খবর পাবে।

কিন্তু মাত্র দুদিন পরে র‍্যাভেনস দ্বীপে ফিরে এলো।

— কি ব্যাপার? সবাই প্রশ্ন করে।

র‍্যাভেনস একটু থামল। তারপর বলল: এমন কিছু নয়, পথ চিনে ঠিক বেরোতে পারলাম না। ক্যাপটেন সায়েবের কাছ থেকে ভালো করে সব জেনে নিয়ে আবার বেরোব।

পরের শুক্রবার পয়লা সেপ্টেম্বর র‍্যাভেনস আবার নৌকা ভাসাল। আবার সমুদ্রের ধারে সেই ভিড, সেই ফেয়ার ই-ওয়েল।

র‍্যাভেনস সবাইকে আশ্বাস দিলো, ভয় নেই আমরা পরের চাঁদে ঠিক ফিরে আসব। "ই শ্যাল বি সেভড···"বলে গিয়েছিল র‍্যাভেনস।

সে এমন আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল যে ভারজিনিয়া পৌঁছে সে একখানা জাহাজ নিয়ে আসবে। সেই জাহাজে চাপিয়ে দ্বীপের সকলকে সে ভারজিনিয়া নিয়ে যাবে।

আবহাওয়া এখন ভালো। সমুদ্র শান্ত। আপাতত কিছুদিন ঝড়ের কোনো আশংকা নেই। দ্বীপবাসীরাও ভাবল তাদের আশা পূর্ণ হবে। র‍্যাভেনস জাহাজ নিয়ে আসবে, তাদের উদ্ধার করবে, ওরা ভারজিনিয়া যেয়ে পরিচিতদের সঙ্গে মিলিত হবে।

পরের চাঁদ যখন এসে গেল তখন দ্বীপবাসীরা সমুদ্রের ধারে জমায়েত হয়ে র‍্যাভেনসের নৌকোকে সংকেত দেবার জন্যে আগুন জ্বালায়। আগুনের শিখা আর ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে ওঠে। ধোঁয়ার সেই কুণ্ডলী বহু দূর থেকে দেখা যাবার কথা।

কিন্তু র‍্যাভেনস তো ফিরে আসছে না। আকাশ যেখানে সমুদ্রের ওপর নেমে এসেছে, সেইপর্যন্ত কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এমন কি একটা বিন্দুও নয়। নৌকোর পাল তো দূরের কথা।

দ্বীপবাসীরা আরও কয়েক দিন আগুন জালিয়ে রাখল। আরও কিছু দিন অপেক্ষা করল। অবশেষে নিরাশ হয়ে তারা ঘাড় নাড়তে লাগল। র‍্যাভেনস বোধহয় ফিরবে না।

বোধহয় নয়, হেনরি র‍্যাভেনস আর কোনোদিনই ফেরে নি। দ্বীপবাসীরাও আর কোনোদিন তাকে বা তার সাতজন সঙ্গীকে দেখে নি। এমন কি র‍্যাভেনসের সেই পালতোলা লম্বা নৌকো ভারজিনিয়াতেও পৌঁছয় নি।

র‍্যাভেনস যে কোথায় গেল বা কি হলো তার কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় নি। নৌকোর একটা ভাঙা কাঠ কিংবা ছেঁড়া পাল কিংবা পানীয় জলের খালি ড্রাম সমুদ্রে ভাসতে দেখা যায় নি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন দ্বীপবাসীরা বোধহয় ভেবেছিল যে সমুদ্রের নিচে যে সব শয়তানের দল আছে তারা র‍্যাভেনসের নৌকো জলের গভীরে টেনে নিয়ে গেছে। মানুষগুলোকে তারা খেয়ে ফেলেছে।

র‍্যাভেনসের এই বিস্ময়কর নিরুদ্দেশ হলো বারমুণ্ডা ট্রাঙ্গেলের প্রথম রহস্য।

এই ঘটনার পর দ্বীপবাসীরা মনস্থির করে ফেলল যে তারা আর এই দ্বীপে বাস করবেন না। দ্বীপে যা কাঠকাটরা পাওয়া গেল তাই থেকেই তারা পরবর্তী আট মাসের মধ্যে সমুদ্রে যাবার উপযোগী বড় বড় দু'খানা নৌকো তৈরি করে ফেলল। দ্বীপে ছিল ১৪৩ জন লোক। তাদের সকলেরই দুটো নৌকোয় স্থান সংকুলান হয়ে যাবে।

যেদিন তারা দ্বীপে নেমেছিল তার প্রায় এক বছর পরে ১০ মে ১৬১০ তারিখে তারা ভারজিনিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল এবং ৫৮০ মাইল অতিক্রম করে ঠিক দু সপ্তাহ পরে ভারজিনিয়ার জেমস টাউনে পৌঁছে গেল। বোঝাই যাচ্ছে পথে তাদের কোনো বিপদ হয় নি, সমুদ্রের গভীরের শয়তানেরা তাদের গ্রাস করবার জন্যে উঠে আসে নি।

সত্যি কোথাও সেইরকম শয়তানে দল আছে কিনা তা হেনরি র‍্যাভেনস হয়তো বলতে পারত কিন্তু সে তো আর ফেরে নি।

সে রহস্য রহস্যই রয়ে গেল এবং দীর্ঘদিন ধরে এই র‍্যাভেনস রহস্য ছিল নতুন দেশের অধিবাসীদের আলোচনার বিষয়।

এই হলো বারমুডা ট্রাঙ্গেলের রহস্যের আরম্ভ।

২

ক্যাপটেন বোনিলার জাহাজ সেই ঘন কুয়াশার দিকে এগিয়ে চলল, সমুদ্র উত্তাল, কি হবে কে জানে···

এ পথ গেছে কোন্‌খানে ?

কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার স্পেনের ভাগ্য ফিরিয়ে দিলে। তাকে সন্ধান দিলো নতুন সমুদ্রপথের, নতুন দেশের ও নতুন সম্পদের। ভাগ্যদেবী স্পেনের প্রতি সুপ্রসন্ন হলেন।

ঠিক এই সময়েই ফারডিনাণ্ড ও ইসাবেলার শাসনাধীনে স্পেন তার পুরনো শত্রু মুরদের দীর্ঘদিনের যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের দেশছাড়া করল। ঘরে একটা ঝামেলা মিটল এখন বিদেশের দিকে স্পেন মন দিতে পারবে। এজন্যে তাকে তৈরি করতে হবে মজবুত সৈন্যদল ও সুদৃঢ় নৌবাহিনী না হলে বিদেশী সম্পদ সে আহরণ করবে কি করে ?

নতুন জগতে এখনও অনেক দেশ রয়েছে যেখানে ইয়োরোপের অপর কোন রাষ্ট্র এখনও পৌছয় নি। মেকসিকো, ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক দ্বীপ।

ওদিকে একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হবে।

কলম্বাস যেবার শেষবার আমেরিকা গিয়েছিলেন তার পনেরো বছর পরে স্পেনের ফারনানডেজ ডি করডোবা মেকসিকো কূলে অবতরণ করলেন এবং তার পরেই দু'বছরের মধ্যে গেলেন গ্রিজভালা। সোজা কথায় এরা দু'জন স্পেনের পক্ষে মেকসিকো বিজয় সম্পূর্ণ করলেন কিন্তু কোরটেস ? ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, মেকসিকো এবং পেরুর ওপর স্পেন রীতিমত প্রভুত্ব বিস্তার করল। এই সব দেশ থেকে স্পেন সোনা, রুপো, খনিজ রত্ন, কচিনিল নামে বস্ত্র ছোপাবার রং জাহাজ ভর্তি করে আমদানি করত আর আমদানি করত ক্রীতদাসের পাল। মধ্য আমেরিকার আরওয়াক ইণ্ডিয়ানদের সহজেই কথায় ভুলিয়ে জাহাজে তোলা যেত তারপর মোটা লাভে তাদের বিক্রি করে দেওয়া হতো বা নিজেরাই বিনা পয়সায় চাকর করে রাখত। স্পেনের সম্পদ দিন দিন বাড়তে লাগল।

স্পেনের পথে নতুন দেশকে লুট করবার জন্য ইয়োরোপ থেকে ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, ডাচ পোর্তুগীজ, ড্যানিশ এবং সুইডিশ জাহাজ নীল সমুদ্রের বুক চিরে ক্যারিবিয়ানের দিকে ভেসে চলল। ওদিকের সমুদ্রে নাকি অনেক বিপদ আছে। বিপদ তো দেশেও আছে। তবে ?

আমেরিকার উপকূলভোগ আর সমস্ত দ্বীপগুলিতে বসতি গড়ে উঠতে লাগল। বন-জঙ্গল কেটে মানুষ বাসা বাঁধল, চাষবাস আরম্ভ করল, জীবজন্তু পুষতে লাগল।

সব মানুষ তো আর সমান নয়। নানা মতলবে নানা লোক আসতে আরম্ভ করল। সমুদ্র দিয়ে দামী সামগ্রী বোঝাই জাহাজের আনাগোনা বাড়ছে। সমুদ্রের বুকেও জাহাজ লুঠ করা যায় আবার সমুদ্রের ধারে কোথাও জাহাজ ভিড়লে তাও লুঠ করা যায়।

একদল দস্যু জাহাজ লুটের কাজে লেগে গেল। বিভিন্ন দ্বীপে এরা আড্ডা গাড়ল। নিজেরা লুকিয়ে থাকবার ও লুটেব মাল লুকিয়ে রাখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করল। এইসব দ্বীপে অনেক পাহাড ও গুহা ছিল। কোনো অসুবিধা নেই। কোনো কোনো বড় জলদস্যু কেল্লাও বানাত। এই অঞ্চলে বা অন্য জাহাজের লুটের মাল বেচবার ভালো বাজার পাওয়া যেত। ওরা বেশ ব্যবসা চালাত। তারপর একদিন বড় বড জলদস্যুর আবির্ভাব হলো। ছোট দস্যুদের তাড়িয়ে তারাই জেঁকে বসল। এইসব বড় জলদস্যুরা দেশের সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছিল। দেশের সরকারের আদেশে এরা শত্রুপক্ষের জাহাজ লুঠপাট করত।

সুদূর দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে স্পেন অনেক বড় বড জাহাজ তৈরি করতে লাগল। তাদের এইসব জাহাজের কিছু জাহাজ জলদস্যুদের জাহাজ রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হতো।

স্পেনের বন্দর থেকে একসঙ্গে অনেক জাহাজ যাত্রা করে ক্যারিবিয়ান সাগরে পৌঁছে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পডত তারপর মেকসিকো, দক্ষিণ আমেরিকা বা অন্য কোনো অঞ্চল থেকে মালপত্র ও ক্রীতদাস সংগ্রহ করে হাভানা বন্দরে সমবেত হতো। তার-পর আবার সবাই দল বেঁধে দেশে ফিরত। যাবার আসবার পথে জাহাজগুলিকে বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের দক্ষিণ অঞ্চল ঘেঁষে যেতে হতো। তখনও বারমুডা ট্র্যাঙ্গল নাম-করণ করা হয় নি।

স্পেন যে সব বড জাহাজ তৈরি করত তার একটা ত্রুটি ছিল। জাহাজগুলো মাথা-ভারি ঝঞ্ঝা বা ঘূর্ণির মধ্যে পড়লে সহজেই ডুবে যেত। সময় সময় একদল জাহাজের সবগুলোই ডুবে যেত। এই ভাবে মূল্যবান সামগ্রী ভর্তি বহু জাহাজ ডুবে গেছে। কতক জাহাজের সন্ধান জানা যায় কতক জাহাজ কোন অজ্ঞাত স্থানে ডুবেছে তা

জানা যায় না। এসব অবশ্য ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা।

ক্যাপটেন ডন জুয়ান ম্যানুয়েল ডি বোনিলার কথাই ধরা যাক। ১৭৫০ সালের শরৎকালে ক্যাপটেন বোনিলা পাঁচখানা বড় জাহাজ নিয়ে স্পেনের দিকে যাত্রা করলেন। সোনা, রুপো, খনিজ রত্ন, অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী এবং ক্রীতদাস দ্বারা জাহাজগুলি যথারীতি বোঝাই ছিল। জাহাজ পাঁচখানার পুরোভাগে ছিল ফ্ল্যাগশিপ 'য়ুয়েস্ট্রা সেলোরা ডিগুয়াডালুপে'। এই জাহাজে ছিলেন ক্যাপটেন বোনিলা। বাকি চারখানা জাহাজ তাঁর জাহাজকে অনুসরণ করে আসবে। সবকটি জাহাজই ছিল বেশ মজবুত, সেকালের পালতোলা জাহাজ।

হাভানা বন্দর ছেড়ে ফ্লোরিডার দক্ষিণে বাহামা চ্যানেলের ভেতর দিয়ে উত্তর গালফ স্ট্রীমের স্রোত ধরে কেপ হ্যাটরাসের দিকে চলল। জাহাজ এবার পড়বে আটল্যান্টিকে অর্থাৎ বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের এলাকায়।

বাতাসে পালগুলো ফুলে উঠেছে। ক্যাপটেন বোনিলার জাহাজ তরতর করে এগিয়ে চলেছে। ক্যাপটেন বোনিলা কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে দূরে সমুদ্র দেখছেন। তিনি কিন্তু বেশ চিন্তিত কারণ তিনি জানেন যে শরৎকালের এই সময়ে আবহাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা করে।

তাছাড়া এখানে একটা খুব খারাপ জায়গা আছে। সেই খারাপ, মানে বিপজ্জনক সমুদ্রের দিকে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। জায়গাটা হলো গালফ স্টিমের উত্তরমুখো স্রোত যেখানে আরটিকের শীতল স্রোত ধাক্কা দিচ্ছে। ঝড়ের দিনে বালি মেশানো সমুদ্রের ঢেউ নাকি দু'শো ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে জাহাজের ওপর আছড়ে পড়ে, জাহাজ ডুবে যায়। শীতল ও উষ্ণ স্রোতের স্পর্শে ঘন কুয়াশাও চারদিক অন্ধকার করে দেয়। তখন মনে হয় জাহাজ বুঝি ভূতের রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

হঠাৎ ক্যাপটেন বোনিলা সভয়ে লক্ষ্য করলেন সমুদ্রের জল কালো হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে ঘূর্ণির সৃষ্টি হচ্ছে, আকাশের রং পালটে যাচ্ছে, কে যেন সীসে গুলে লেপে দিচ্ছে।

অঞ্চলটা আমেরিকার ব্রিটিশ অধিকৃত ক্যারোলিনা থেকে বেশি দূরে নয়। এখানেও এদিকে ওদিকে দ্বীপ আছে যেখানে জলদস্যুরা এখনও বাস করে। যে কোনো দিক থেকে বিচার করা যায় এই অঞ্চলটা ভালো নয়। শয়তানের রাজ্য বললেই হয়। ক্যাপটেন বোনিলা তাঁর চুলে হাত বোলাতে লাগলেন।

কিন্তু ঝড় তো এখনি এসে যাবে। তিনি জাহাজের সবাইকে ডেকে সতর্ক করে দিলেন এবং কাকে কি করতে হবে সে বিষয়ে কড়া নির্দেশ দিলেন।

কিছুদিন পূর্বে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের পর একটা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও

কোনো পক্ষ সন্তুষ্ট হয় নি। ঝড় যদি জাহাজকে ক্যারোলিনা উপকূলে টেনে নিয়ে যায়, সেখানকার ইংরেজরা কি রকম ব্যবহার করবে?

আকাশের চেহারা মোটেই ভালো নয়। প্রচণ্ডবেগে ঝড় এগিয়ে আসছে। কি হবে কিছু বলা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড ঝড়ের বা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের অভিজ্ঞতা ক্যাপটেন বোনিলার নেই। কি করে তিনি ঝড় সামলে জাহাজকে বাঁচাবেন? সবাই কুঠার প্রস্তুত রাখ। ঝড় উঠলে মূল মাস্তুল নামিয়ে না ফেললে জাহাজ উলটে যাবে।

সোঁ সোঁ শব্দে প্রচণ্ড বেগে ঝড় এসে গেল। সেই সঙ্গে সমুদ্রও ফুলে উঠলো। চারদিক অন্ধকার। জাহাজের ডেকের ওপর বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল। ঝড়ের গতি আর সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্চতা ক্রমশ বাড়তে লাগল। জাহাজ বোধহয় বাঁচানো যাবে না।

জাহাজের পাল ছিন্নভিন্ন, জাহাজের ভেতরেও জল ঢুকছে। ডেকের ওপরে যা কিছু ছিল সবই ঝড়ের দাপটে কোথায় উড়ে গেছে কে জানে। ক্ষ্যাপা মোষের মতো জাহাজ যেন ছুটে চলেছে, কখন ডুবে যাবে বা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে কে জানে।

ঝড় এত দ্রুত ও এত প্রচণ্ড বেগে এসে পড়েছিল যে নাবিকেরা ডেকের ওপর দাঁড়াতে পারছিল না এবং মূল মাস্তুলটা নামাতেই পারছিল না। তারা সে চেষ্টা ত্যাগ করেছিল। কিন্তু মূল মাস্তুল নিজেকে আর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারল না। ঝড়ের সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হয়ে ডেকের ওপর ভেঙে পড়ল।

মাস্তুলটাকে ফেলে দেবার জন্যেই ঝড় যেন গতি উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যাচ্ছিল কিন্তু এখন মস্তুল পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের তীব্রতা কমতে লাগল। জাহাজ বিধ্বস্ত হলেও বেঁচে গেল। ডুবল না।

এক সময় ঝড় থেমে গেল। সমুদ্র শান্ত হলো। কিছুই যেন হয় নি। ইতিমধ্যে রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। জাহাজের সব কিছু বিপর্যস্ত। কিছুই কারবার নেই। যে যেরকম ভাবে পারল রাত্রি কাটাল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর নির্জীব নাবিকদল মুমূর্ষু রোগীর মতো সারারাত্রি পড়ে রইল।

পরদিন সকাল। ক্যাপটেন বোনিলা প্রথমে জাহাজের অবস্থা পর্যালোচনা করলেন, হিসেব-নিকেশ করলেন, কতখানি বা কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার একটা অনুমান করলেন। এইটুকু জেনে আশ্বস্ত হলেন যে জাহাজের খোলে বোঝাই মালপত্র ঠিক আছে।

তারপর চোখে দূরবীন লাগিয়ে আর চারখানি জাহাজের সন্ধান করতে লাগলেন।

সমুদ্রের চারদিকে দূরবীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে একখানা জাহাজ দেখা গেল, যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। কিন্তু আর তিনখানি জাহাজের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

যে জাহাজটি বেঁচে গেছে তার মালপত্র নষ্ট হয় নি কিন্তু বাকি তিনটি জাহাজের কোনোই পাত্তা পাওয়া গেল না। ডুবে গিয়ে থাকলেও তার কোনো নিদর্শনও পাওয়া যায় নি। ঝড়ে জাহাজের কিছু ধ্বংসাবশেষ, ছেঁড়া পাল, ডেকের ওপরের মালপত্র বা কিছু মৃতদেহ জলে ভাসতে দেখা যায়।

ছোটখাটো একটা জাহাজ বা নৌকো নয়, তিন তিনটে বড় জাহাজ বলে কথা। তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ক্যাপটেন বোনিলা অপর জাহাজটি নিয়ে সাউথ ক্যারোলিনার একটি বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে দিলেন এবং ইংরেজ গভর্নরের সহায়তায় জাহাজ দুটি মেরামত করে দেশে ফিরেছিলেন কিন্তু বাকি তিনটি জাহাজের কোনো খবরই পেলেন না। সমুদ্র তাদের আস্ত গিলে ফেলেছে।

জাহাজগুলিতে ছিল সোনা, রুপো, কোকো, ব্যালসাম এবং দুষ্প্রাপ্য কচিনিল! সবই গেল। কোকো, কচিনীল বা ব্যালসামের একটিও পিপে কোথাও ভাসতে কেউ দেখে নি। সকল নাবিকই বিস্মিত। তিনটি জাহাজের রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

৩

শোকার্ত সুন্দরী থিওডোসিয়াকে নিয়ে জাহাজ কোথায় গেল? আত্মহত্যা? জলদস্যু? ঝড়···ক্রীতদাসী···

কোথায় গেল পেট্রিয়ট?

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আরম্ভ হয়ে গেল। এবার যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছি, ইংরেজিতে তার শিরোনাম দেওয়া যায় 'এ লেডি ভ্যানিশেস'। ক্যাপটেন বোনিলার তিনটি জাহাজ ম্যাজিকের মতো ভ্যানিশ হয়ে যাবার বাষট্টি বছর পরের ঘটনা। এই সময়ের মধ্যে আরও কিছু জাহাজ ও বড় নৌকো অবশ্য অদৃশ্য হয়েছে কিন্তু প্রতিটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা যায় না।

সুন্দর একটি জাহাজ, একটি পাখির মতো যেন, ছিমছাম, সুদৃশ্য। সাউথ ক্যারোলিনা থেকে যাচ্ছিল নিউইয়র্ক সিটি কিন্তু গন্তব্যস্থলে সে জাহাজ পৌঁছল না।

এই জাহাজের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে গাথা-কাব্য, রচিত হয়েছে মর্মস্পর্শী উপন্যাস। কারণ ঐ জাহাজে বিশিষ্ট একজন মহিলা যাত্রী ছিল। আর সেই মহিলা যাত্রী হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন উপরাষ্ট্রপতি অ্যারন বার-এর কন্যা। কন্যার নাম থিওডোসিয়া বার অ্যালস্টন, সাউথ ক্যারোলিনার গভর্নর জোসেফ অ্যালস্টনের পত্নী।

থিওডোসিয়া ছিল শান্ত, সুন্দরী, তার কালো গভীর চোখে কোথায় যেন একটা গোপন ব্যথা লুকিয়ে আছে। ব্যথা লুকিয়ে থাকবারই কথা। শিশু বয়সেই সে মাতৃ-হারা। পিতার সান্নিধ্যও বেশিদিন পায় নি। পিতা অ্যারন বার যখন ভাইস-প্রেসি-ডেন্ট তখনই তিনি কোনো গভীর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। আলেকজাণ্ডার হ্যামিল-টনের সঙ্গে ডুয়েল লড়তে হয়, তার ফল ভালো হয় নি। তার ওপর তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়।

অ্যারনকে কিছুদিন পালিয়ে বেড়াতে হয় তারপর বিচার হয়। বিচারে মুক্তি পেলেও জনমত তার অনুকূলে ছিল না অতএব অ্যারন বারকে দেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে চলে যেতে হয়।

ইতিমধ্যে থিওডোসিয়ার বিয়ে হয়েছে। তখন তার বয়স সতেরো বছর। স্বামী একটি স্টেটের গভর্নর কিন্তু তিনি সদাই ব্যস্ত। থিওডোসিয়াকে অধিকাংশসময় একা কাটাতে হয়।

এরই মধ্যে সান্ত্বনা। একটি ছেলে হয়েছে। বাবার নামে ছেলের নাম রেখেছে অ্যারন। নিজেও বাবার কাছে যেতে পারছে না, বাবাকে ছেলে দেখাবার জন্যে ব্যগ্র কিন্তু হয়ে উঠছে না।

এমন সময় ইংলণ্ড থেকে অ্যারন বার থিওডোসিয়াকে চিঠি লিখলেন যে তিনি আমেরিকায় ফিরছেন। আমেরিকায় বসবাস করবেন, নিউইয়র্কে তিনি থাকবেন, অ্যাটর্নিগিরি করবেন। থিওডোসিয়ার অনন্দ আর ধরে না, বাবা ফিরে আসছেন। বাবাকে নিজের কাছে এনে কিছুদিন রাখবে।

অ্যারন বার যখন নিউইয়র্কে এসে পৌছল থিওডোসিয়া তখন তার ছেলেকে নিয়ে পলি'জ আইল্যাণ্ডে গ্রীষ্মের অবকাশ কাটাচ্ছিল। ছেলের বয়স তখন দশ বছর। থিওডোসিয়ার ইচ্ছা বাবাকে আনবার জন্যে কারও সঙ্গে ছেলেকে নিউইয়র্কে পাঠাবে।

এমন সময় ছেলে জ্বরে পড়ল। ভীষণ কাঁপুনি, হাই টেমপারেচার। ডাক্তার বলল ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার তখন ওষুধ বেরোয় নি। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু অ্যারনকে বাঁচাতে পারলেন না। ১৮১২ সালের জুন মাসের শেষে থিওডোসিয়ার

ছেলেটি মারা গেল।

শোকে অভিভূত থিওডোসিয়া কিছুতেই সামলে উঠতে পারছে না। রাত্রে ঘুমোতে পারে না। শরীর দুর্বল হতে লাগল। সে ঠিক করল বাবার কাছে যাবে। স্বামীরও তাই ইচ্ছে। বাবার কাছে কিছুদিন কাটিয়ে এলে দেহমন দুই-ই ভালো হবে, এমন আশা করা যায়। তাছাড়া নিজের সন্তানের মৃত্যুর পর থিওডোসিয়া তার বাবার জন্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। থিওডোসিয়ার আশঙ্কা তার বাবা কন্যার শোকে নিজে ব্যাকুল হবেন।

এই সব চিন্তা করে থিওডোসিয়াকে নিউইয়র্কে তার বাবারকাছে পাঠাবার জন্যে জোসেফ অ্যালস্টন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জোসেফ অ্যালস্টন একটা পুরো জাহাজ ভাড়া করা স্থির করলেন। একটা জাহাজ চার্টার করে সেই জাহাজে স্ত্রীকে নিউ ইয়র্ক পাঠাবেন।

জোসেফ অ্যালস্টন যখন জাহাজ কোম্পানিব সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন সেই সময়ে চার্লস্টন বন্দরে তাঁর প্ল্যান্টেশনে নিউইয়র্ক থেকে একজন ভদ্রলোক এসে হাজির। ভদ্রলোকের নাম টিমথি গ্রীন, জোসেফ অ্যালস্টনের শ্বশুর অ্যারন বারের তিনি ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধু। অ্যারন বার টিমথিকে পাঠিয়েছেন তাঁর কন্যা থিওডোসিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আসতে। জামাই সঙ্গে আসতে পারবে না, মেয়ের শরীর ভালো নয়। এতদূর একা আসতে পারবে না। সেই জন্যে জোসেফ অ্যালস্টন তার বন্ধু টিমথিকে পাঠিয়েছেন।

বন্ধুকন্যাকে নিয়ে যাবার জন্য টিমথি গ্রীন সকল ব্যবস্থা করেছে অতএব জোসেফ অ্যালস্টনকে আর কিছু করতে হলো না। 'পেট্রিয়ট' নমে একটি ছোট জাহাজে থিওডোসিয়ার জন্যে কেবিন ভাড়া করা হয়েছে।

'পেট্রিয়ট' জাহাজটির নাম সুবিদিত। গভীর সমুদ্রে যায় না। দ্রুতগামী। ডাক বহন করে এবং উপকূলের বন্দরের যাত্রী ও মাল বহন করে। ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জাহাজটিতে কামান বসানো হয়েছিল এবং নৌ-যুদ্ধে অংশ গ্রহণও করেছিল।

নিউইয়র্ক বন্দর তখনও বুঝি ব্রিটিশ অবরোধ করে রেখেছিল কিন্তু থিওডোসিয়ার জন্য বিশেষ অনুমতি নেওয়া হলো। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাহাজটি ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। এজন্যে জাহাজের কামানগুলি তুলে ফেলতে হয়েছিল।

জাহাজ ছাড়বে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮১২ সালের শেষ দিনটিতে। টিমথি গ্রীন সঙ্গে থাকবে। জোসেফ অ্যালস্টন জাহাজ পর্যন্ত যেতে পারবে না। অন্যত্র জরুরী কাজ আছে। তাঁর কাকা উইলিয়ম অ্যালস্টন জাহাজে তুলে দিয়ে আসবে। সমুদ্র যাত্রার সময় থিওডোসিয়ার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে উইলিয়ম অ্যালস্টন

জাহাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আসবেন। কোনো ত্রুটি রাখা হবে না।

উইনিয়া উপসাগরের জর্জটাউন বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়বে। সকাল থেকে সবাই ব্যস্ত। দু'খানা জুড়ি গাড়ি এসেছে। থিওডোসিয়ার সঙ্গে তার একজন পরিচারিকা যাবে। টিমথি গ্রীন তো থাকবেই আর এছাড়া অ্যালস্টন সঙ্গে একজন ডাক্তার দিচ্ছেন। ডাক্তারটি গর্ভনরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক।

মালপত্র আগেই গাড়িতে উঠে গেছে এবার থিওডোসিয়া গাড়িতে উঠলো। জোসেফ অ্যালস্টন নিচে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে বিদায় জানালেন। থিওর যখন বয়স সতেরো এবং তাঁর বয়স বাইশ তখন দু'জনের বিয়ে হয়েছিল। থিওর বয়স এখন উনত্রিশ কিন্তু থিওকে আজ কি সুন্দর দেখাচ্ছে, ঠিক যেন সেই বারো বছর আগে দেখা তরুণীটির মতো।

গাড়ি ছেড়ে দিলো। দুই সারি ওক গাছের মাঝখান দিয়ে আলো-ছায়ার ভেতর দিয়ে গাড়ি চলে গেল। যতক্ষণ না গাড়ি গেট ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়ল ততক্ষণ জোসেফ গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর এই বাড়ি "দি ওকস" এখন ফাঁকা হয়ে গেল। আবার যেদিন থিও ফিরবে তখন আবার সারা বাড়ি আনন্দমুখর হয়ে উঠবে। থিও চলে যেতেই মৃত বালকের স্মৃতি জোসেফের মনের দরজায় বার বার আঘাত করতে লাগল। এই তো সেদিন এই বারান্দায়, এই বাগানে খেলা করে বেড়াতো আর আজ সে নেই। কোনোদিন সে আর অসবে না।

অনেক কাজ আছে। জোসেফ অ্যালস্টন নিজের মনে অফিস ঘরের দিকে চললেন। শূন্য বাড়ি, শূন্য মন, কাজের মধ্যে ডুবে যেতে হবে।

জর্জটাউন হারবর কাছে নয়, বেশ দূর। ওদের ঘোড়ার গাড়ি পৌছল পরদিন। গড়ি গিয়ে থামল একেবারে ডকে। 'পেট্রিয়ট' জাহাজখানা দেখা যাচ্ছে। ছিমছাম সুন্দর জাহাজটি, থিওডোসিয়া খুশি, সে কথা টিমথি গ্রীনকে বলল।

টিমথি গ্রীন থিওডোসিয়া ও তার পরিচারিকাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, ডাক্তার তাদের অনুসরণ করে চলল।

জাহাজে উঠে সমুদ্রের হাওয়ার স্পর্শে থিওডোসিয়া হঠাৎ প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। জাহাজের ডেকে এসে একবার এদিকে যায় একবার ওদিকে। তাকে ডাক্তার সতর্ক করে দেয়, হঠাৎ উত্তেজনা ভালো নয়।

—কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার যে খুব ভালো লাগছে, আর একটু বেড়াই···তারপর কেবিনে যাব, কি সুন্দর!

'পেট্রিয়ট' জাহাজের কমাণ্ডারের নামটি বেশ মজার। তাঁর নাম ক্যাপটেন ওভারস্টক্স তিনি তার নিজের পরিচয় দিয়ে গর্ভনর পত্নীকে অভিবাদন জানালেন।

ক্যাপটেনকে টিমথি গ্রীন আগে থেকে জানতেন। তিনি জানতেন ক্যাপটেন ওভারস্টক্স অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ নাবিক, তাঁর তুল্য নাবিক তখন অ্যাটলান্টিক উপকূলে দ্বিতীয় জন কেউ ছিল না। টিমথি গ্রীন নিশ্চিন্ত। তাঁরা নিরাপদেই নিউইয়র্ক পৌঁছবেন।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিউইয়র্ক বন্দরে প্রবেশ করবার অনুমতি-পত্র এবং গভর্নর জোসেফ অ্যালস্টনের নিজের হাতে লেখা একখানি চিঠি টিমথি গ্রীন ক্যাপটেনকে দিলেন।

টিমথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যাপটেন, নিজের ঘরের দিকে চললেন।

নিউইয়র্ক পৌঁছতে পাঁচ দিন লাগবে। পথে ব্রিটিশ জাহাজ যদি তাদের না থামায় তাহলে হয়তো তারা আর ওআগে পৌঁছে যাবে। আবহাওয়া তো এখন ভালোই। এসময়ে ঝড় ওঠে না, সমুদ্রে তুফানেরও তেমন কোনো আশঙ্কা নেই।

ক্যাপটেন ওভারস্টক্স নোঙর তোলবার আদেশ দিলেন। বাতাসে পালগুলি তো ফুলে ছিলই। নোঙর তোলার পর জাহাজ ঢেউ কেটে সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলল।

কিন্তু সেই জাহাজ যার নাম 'পেট্রিয়ট' যে জাহাজে ছিল অসামান্য সুন্দরী এক বধূ, যার নাম থিওডোসিয়া, শুভক্ষণ দেখে যে জাহাজ বন্দর ত্যাগ করেছিল চেনা পথ দিয়ে সেই জাহাজ তার গন্তব্য বন্দর নিউইয়র্কে কোনোদিন পৌঁছল না।

সেই 'পেট্রিয়ট' জাহাজ কোথায় যে গেল তা আজও রহস্য। জাহাজ ঝড়ে ধ্বংস হলে বা ডুবে গেলেও তার যে সব লক্ষণ বা চিহ্ন সমুদ্রের ওপর দেখা যায় বা পাওয়া যায় তার কিছুই দেখাও যায় নি বা পাওয়াও যায় নি।

ঝড়ের মুখে পড়েছিল? সেদিন ঝড়ের মুখে কি ঐ একখানা জাহাজই পড়েছিল? আর ডুবল যদি তাহলে কারণটা কি? মজবুত একখানা জাহাজ যার ক্যাপটেন হলো অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ সেই জাহাজ হঠাৎ ডুববেই বা কি করে?

ডুবে যাবার পর জাহাজের কিছু জিনিসপত্তর সমুদ্রের ওপর ভাসতে দেখা যায়। তার কিছুই দেখা গেল না? দু একটা মৃতদেহ, বাক্স, কাঠ-কাটারা, পোশাক-পরিচ্ছদ বা অন্য কিছু না? কিছুই না? তবে সে জাহাজ গেল কোথায়? পাখা মেলে আকাশে উড়ে গেল?

সকন্যা, 'পেট্রিয়ট' জাহাজের আগমন প্রতীক্ষায় শোকার্ত পিতা অ্যারন বার নিউইয়র্ক বন্দরের কাঠের পাটাতনের ওপর পায়চারি করছেন। বন্দরের কর্মীদের মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন, কিছু খবর পাওয়া গেল? দক্ষিণ দিকে আর কোনো জাহাজ এসেছে কি?

কিন্তু না, কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। থিওডোসিয়াকে তার বাবা বা তার স্বামী

আর কোনোদিনই দেখতে পান নি। দিন, সপ্তাহ, মাস কেটে গেল যখন তখন উভয়েই নিষ্ঠুর সত্যকে স্বীকার করে নিলেন, তাদের প্রিয়তমা আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না। অসীম সমুদ্র তাকে গ্রাস করেছে।

পিতা অ্যারন বার এবং স্বামী জোসেফ অ্যালস্টন, পরস্পরকে চিঠি লিখে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন।

অ্যালস্টন কিন্তু তার পত্নীকে ভুলতে পারেন নি। তিনি সর্বদা পত্নীর স্মৃতিতে ডুবে থাকতেন, কাজের মধ্যেও থিওকে ভুলতে পারতেন না।

প্রথম আঘাত পুত্রশোক, দ্বিতীয় আঘাত পত্নীশোক। তিনি আর তিন বছর বেঁচে ছিলেন।

অ্যারন বার ছাড়েন নি, তিনি অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 'পেট্রিয়ট'-এর বিষয় তিনি নানা সূত্র থেকে খোঁজ নেবার চেষ্টা করতেন এবং আশ্চর্যের বিষয় যে 'পেট্রিয়ট' জাহাজ ও থিওডোসিয়া বার-এর রহস্যময় অন্তর্ধান নিয়ে লেখক বা সংবাদ সূত্রের আগ্রহ ও কৌতূহলের শেষ ছিল না। এখনও মাঝে মাঝে কেউ কেউ রহস্য সমাধানের চেষ্টা করেন।

জলদস্যুরা যদি জাহাজখানাকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে? আটকে রেখে দিয়ে থাকে তাদের অজানা কোনো আড্ডায়? তারপর জাহাজের চেহারা পালটে তাকে বিদেশে বিক্রি করে দিয়ে থাকে? আর থিওডোসিয়াকে হয়তো কোনো জলদস্যু তার ক্রীত-দাসী করে রেখেছে। ক্রীতদাসী হতে রাজী না হওয়ায় তাকে খুন করেও থাকতে পারে কেউ। আত্মহত্যা? আশ্চর্য নয়।

এবং কিছু কাহিনী শোনাও যায়।

প্রথম কাহিনী শোনা গেল ১৮৩৫ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবান রাজ্যে ছোট শহর মবিল। সেই শহরের ছোট একটি সরাইখানা। সরাইখানার মালিক তার ঘরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাকে কি রোগে ধরেছে কেউ জানে না তবে যে কোনো দিন যে কোনো সময়ে লোকটা মারা যেতে পারে। বিকারের ঘোরে সে প্রলাপ বকে। মাঝে মাঝে উঠে বসবার চেষ্টা করে আর চিৎকার করে।

'ঐ তো, ঐ তো সেই সুন্দরী চলে যাচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?'

প্রতিবেশীরা ডাক্তার অ্যালেকস জোনসকে ডেকে আনল। লোকটা তো মরবেই তবে বিনা চিকিৎসায় মরে কেন? একটা চিকিৎসা হোক। আর ও এসব কি ভুল বকছে? তারও একটা কিনারা হওয়া দরকার। ডাক্তারবাবু এলেন। লোকটা যে একটা দুর্দান্ত জলদস্যু ছিল তা তার এখনকার জীর্ণ শীর্ণ চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই। তার রোগক্লিষ্ট দেহ বিছানার সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে গেছে।

ডাক্তারবাবু যখন তার নাড়ী দেখছেন তখন লোকটি ডাক্তারবাবুর হাত সরিয়ে নিজের দু হাত দিয়ে ডাক্তারবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে বলল :—ডাক্তারবাবু মেয়েটা আবার এসেছে ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু বাঁচান, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

লোকটা কি হালুসিনেশন দেখছে? দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে? ডাক্তারবাবু ভাবেন। তবুও জিজ্ঞাসা করেন :

—তুমি কাকে দেখছ, কে এসেছে?

—ও আপনি জানেন না বুঝি? মেয়েটির নাম থিওডোসিয়া বার ·

থিওডোসিয়া বার! লোকটা বলে কি? সেই মহিলা তো কবেই সমুদ্রে হারিয়ে গেছে! তা প্রায় পঁচিশ বছর হবে। লোকটা তার ছায়ামূর্তি দেখছে? এ তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—সেই মহিলা তো কবেই নিখোঁজ, তাঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?—আছে, আছে ডাক্তার সম্পর্ক আছে, আমাদের পাইরেটশিপ পেট্রিয়ট জাহাজের ওপর চড়াও হয়েছিল কিন্তু আমরা তো মিসেস বারকে তখনও চিনি না, প্রথমে চেনবার চেষ্টাও করি নি, আগে জাহাজ লুঠ করা হলো তারপর যখন সেই সুন্দরীর পরিচয় জানা গেল তখন তো তাকে আর ছেড়ে দেওয়া যায় না। সে বেঁচে ফিরে গেলে আমাদের বিপদ কিন্তু অমন সুন্দরীকে কে খুন করবে? এমন নিষ্ঠুর কে আছে? হাঁফাতে হাঁফাতে লোকটা বলতে লাগল : আমার রক্তে তখন খুন চেপেছে, 'পেট্রিয়ট' জাহাজের দুটো নাবিককে তলোয়ার দিয়ে কেটেছি, তলোয়ারে তখনও তাজা রক্ত লেগে রয়েছে। আমি এগিয়ে এলুম তারপর···,

লোকটার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। কথা বুঝি আর শেষ করতে পারবে না। মরেই গেল বুঝি। কিন্তু এদের প্রাণ সহজে যায় না। দম নিয়ে বলতে লাগল :—

—ঐ তো আমার সামনে এসে আবার দাঁড়িয়েছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, ঐ ·· করে বলছে আমাকে মেরো না, আমার বাবাকে আমার স্বামীকে ·· নেই, সে কি করুণ আবেদন কিন্তু আমি তখন উন্মত্ত, আমি তার ·· নুম না···

·· দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল, পারল না। ধপ করে

মামাকে ক্ষমা কর···

· কথা। ডাক্তারতার নাড়ী টিপে দেখলেন। কোনো স্পন্দন নেই।

শেষ হয়ে গেছে।

এই কাহিনী ডাক্তারবাবু অনেককে বলেছিলেন। ডাক্তার অ্যালেকস জোনসের মুখ থেকেই এই কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। কেউ বিশ্বাস করেছিল কেউ বিশ্বাস করে নি।

জলদস্যুর পাপের এই শেষ স্বীকারোক্তি নয়। আরও স্বীকারোক্তি আছে। কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা কে বলবে।

আরও একজন জলদস্যু, ফরাসি, তার নাম জিন ব্যাপটিস্ট ক্যালিস্টার। সে-ও তার মৃত্যু শয্যায় এক স্বীকারোক্তি করেছিল। সে বলেছিল :

মঁসিয়ে শভের পাইরেট শিপ 'ভেঞ্জেন্স'-এর আমি ছিলুম গোলন্দাজ। 'পেট্রিয়ট' জাহাজখানা যখন উত্তরদিকে মন্থর গতিতে ভেসে যাচ্ছিল আমরা তখন তাকে তাড়া করলুম এবং অতি সহজেই আমরা জাহাজখানা ধরে ফেলে তার ওপর চড়াও হলুম। বলতে গেলে কোনো প্রতিরোধই পাই নি। লুটের মালের সঙ্গে আমরা একজন সুন্দরী মহিলাকেও পেয়েছিলুম। যেমন রূপ তেমনি তেজ।

লুটের মালের সঙ্গে আমরা তাকে গালফ অফ মেকসিকোতে আমাদের আড্ডা গ্যালভেস্টনে ধরে নিয়ে গেলুম। কিন্তু দ্বীপে গিয়ে সে বেশিদিন বাঁচে নি, আমরা ঐ দ্বীপেই তাকে কবর দিয়ে দিলুম, দশ ফুট মাটি খুঁড়লে তার কঙ্কাল এখনও পাওয়া যাবে ··

আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? এই দেখ, লোকটি একটি সোনার লকেট বার করল। লকেটের ওপর দুটি অক্ষর টি. এ। থিওডোসিয়া অ্যালস্টন ? হতে পারে। লকেটের ভেতরে একটি বালকের ছবি।

স্বীকারোক্তির শেষ নেই। সকলে বোধহয় মৃত্যুশয্যাতেই স্বীকারোক্তি করে। এ ব্যক্তিও তাই করেছিল। লোকটির নাম ফ্র্যাংক বারডিক। মিচিগানে থাকত। বৃদ্ধ হয়েছিল। মৃত্যুশয্যায় সে স্বীকার করল থিওডোসিয়া বারকে সে খুন করেছে। লোকটি একদা জলদস্যু ছিল।

চমকপ্রদ আরও একটা স্বীকারোক্তি জানা গেল। এই স্বীকাররোক্তিও একজন জল-দস্যুর এবং জলদস্যুর নাম শুনলে অবাক হবারই কথা। মনে হবে অবিশ্বাস্য।

জলদস্যুর নাম জন হাওয়ার্ড পেন, বিখ্যাত কবিতা 'হোম সুইট হোম, দেয়ারস নো প্লেস লাইক হোম' এর রচয়িতা। পেন একজন সুদক্ষ পাইরেট ছিলেন।

অ্যালাবামা স্টেটের মন্টগোমারি শহরের আরকাইভস বিল্ডি-এ রক্ষিত ১৪৫ বৎসরের পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে ফস্টার হেলি, চার্লস্টন শহরের 'নিউজ অ্যাণ্ড কুরিয়ার' পত্রিকার ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ তারিখে ম্যাগাজিন অংশে একটি প্রবন্ধ লেখে।

প্রবন্ধটি মোটামুটি ভাবে জন হওয়ার্ড পেন-এর বিবৃতি। পেন নাকি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে স্বীকার করেছিলেন যে একদা তিনি পাইরেটই ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্বদেশ-বিহীন মানুষ, মারা গিয়েছিলেন উত্তর আফ্রিকার টিউনিস বন্দরে। টিউনিস ছিল জলদস্যুদের বড় ঘাঁটি। মরবার পূর্বে স্বীকারোক্তি করে তিনি তাঁর জীবনের পাপ পবিচ্ছেদটি থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন বোধহয়।

অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের দস্যুবৃত্তি করে বেড়ানো পেন ছিলেন সেইরকম একটি দলের শেষ পাইরেট। পেন যে জাহাজে ছিলেন সেই জাহাজ একদিন হঠাৎ 'পেট্রিয়ট' জাহাজটি আক্রমণ করে। জাহাজের ক্যাপটেন ওভারস্টক্স সহজেই আত্মসমর্পণ করে কিন্তু আত্মসমর্পণ করলে কি হবে পাইরেটরা জাহাজের সকলকেই কেটে ফেলে এমন কি জাহাজের মহিলা যাত্রীদেরও।

একজন মহিলাকে দেখে মনে হয়েছিল উচ্চ বংশের, অপরজন তার পরিচারিকা। পেন পরে মহিলার নাম জানতে পেরেছিল, থিওডোসিয়া বার। কিন্তু দস্যুদের তাতে কি আসে যায়। তারা তাঁর চোখ বেঁধে তরবারির আঘাতে মেরে ফেলে।

পেন এই ঘটনা ভুলতে পারেন নি। এই নৃশংস হত্যা পেন-এর মনে আঘাত করেছিল।

৪ অগস্ট ১৯৬৩ তারিখে চার্লস্টনের ঐ নিউজ অ্যাণ্ড কুরিয়ার পত্রিকার আরও একটি নতুন কাহিনী প্রকাশিত হয়। লেখক আর জে ক্যানাডে। ক্যানাডে কিছু নতুন কথা শোনালেন। থিওডোসিয়া নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন! পেট্রিয়ট জাহাজে থাকাকালীন দৈনন্দিন ঘটনার বিষয় এমন কি শেষ দিনের কথাও তিনি লিখেছেন। থিওডেসিয়া তাঁর জীবনের শেষ দিনের বিবরণী লিখে সেটি এবং তাঁর আঙুলের ওয়েডিং রিং একটি বোতলে ভর্তি করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিলেন।

সেই বোতল দীর্ঘদিন জলে ভাসতে ভাসতে একদিন আমেরিকার কূলে এসে ঠেকে। বোতল ও বোতলের ভেতর রক্ষিত সেই দলিল ও আংটি জনৈক কর্নেল জালটিন ডেন কিনে নেন এবং তাঁর সব বন্ধুদের দেখিয়েছিলেন।

বোতলের ভেতরে প্রাপ্ত সেই কাগজে লেখা ছিল 'পেট্রিয়ট' জাহাজ ভ্রমণের কাহিনী। প্রথম দিন সন্ধ্যা ছ'টার সময় থেকেই বেশ জোরে বাতাস বইতে আরম্ভ করল এবং পরের দিন ভোর হতে না হতেই প্রবল বেগে ঝড় আরম্ভ হলো। ছোট জাহাজ রীতিমতো দুলতে লাগল।

থিওডোসিয়া ডেকে এসেছে। জাহাজখানা যাতে পুব দিকে যায় ক্যাপটেন ওভারস্টক্স সেই নির্দেশ দিচ্ছেন কিন্তু জাহাজ ঝড়ের টানে দক্ষিণ দিকে যেতে আরম্ভ করেছে।

তারপর থিওডোসিয়া লিখছে যে আবহাওয়া একটু একটু করে গরম হচ্ছে, চার-দিকের বরফ গলছে। ক্যাপটেন বললেন, 'পেট্রিয়ট' এখন গালফ স্ট্রিমে পড়েচে। জাহাজ এখন কিউবার দিকে চলেছে, সেদিকে সমুদ্র শান্ত। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

থিওডোসিয়া ও তার পরিচারিকা বিশ্রামের জন্যে কেবিনে প্রবেশ করল। ক্যাপটে-নের আশ্বাস সত্বেও শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হলো না। আঘাত এলো অন্য দিক থেকে।

পরদিন থিওডোসিয়াব ঘুম ভাঙলো খুব ভোরে। মেঘমুক্ত নীল আকাশ। চারদিক শান্ত। থিওডোসিয়া এবং কয়েক জন যাত্রী তখন জাহজের ডেকে পায়চারি করছে। অনেক দূরে থিওডোসিয়া যেন একটা জাহাজ দেখতে পেল।

ক্যাপটেনকে সে কথা বলতে ক্যাপটেন দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপটেন দূববীন নামাল। তার গম্ভীর মুখ দেখে থিওডোসিযা ভয় পেল। ক্যাপটেন বললেন: জাহাজখানায় একটা কালো নিশান ঝুলছে তার ওপব ঘোব লাল রঙে টি অক্ষব লেখা রয়েছে।

— কাদের জাহাজ? থিওডোসিয়া জিজ্ঞাসা করল।

ম্যাডাম আমাদেব ভীষণ বিপদ, ঐ জাহাজখানা হলো দুর্ধর্ষতম ও নৃশংসতম পাইরেট ক্যাপটেন থ্যাডিয়াস বনকোর্টের।

ক্যাপটেন থ্যাডিযাস বনকোর্ট যদি তাদের জাহাজ আক্রমণ করে তাহলে তার ফল কি হতে পারে তাই অনুমান করেই থিওডোসিয়া বোধহয় বিববণী লিখে বোতলে ভরে এবং প্রমাণস্বরূপ নিজের ওযেডিং রিং সঙ্গে দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিল!

এই বোতল পরে ক্যাপটেন ডেনের হাতে আসে এবং এই হলো কাহিনী। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, কোন্‌টা কাল্পনিক কে বলতে পারে?

আরও একটি কাহিনী জানা গেছে। আমেরিকার নিউ ইংলণ্ড স্টেটের লেখক এড-ওয়ার্ড রো স্নো-এর শখ ছিল সামুদ্রিক কাহিনী, গালগল্প, উপকথা ইত্যাদি সংগ্রহ করা। এই সব সংগ্রহের কাজে তিনি সমুদ্রের ধারে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। এই রকম ঘুরতে ঘুরতে এক বৃদ্ধার ঘরে স্নো একজন যুবতীর চমৎকার একটি প্রতি-কৃতি দেখে বিস্মিত হয়। এমন একখানা প্রতিকৃতি সেই বৃদ্ধার ঘরে থাকবার কথা নয়।

স্নো-এর প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধা বলল যে তার যৌবনে তার এক প্রেমিক ছবিখানা তাকে উপহার দিয়েছিল। যুবক সন্দেহজনক চরিত্রের ছিল, কি যে করত, কোথা থেকে ছবি পেল তা সে জানে না।

যুবতীর সেই প্রতিকৃতি পরে বৃদ্ধার হাতছাড়া হয়। ডাক্তারের পাওনা বিল বাবদ

বৃদ্ধা ছবিখানি তার ডাক্তারকে দেয়। তারপর ছবিখানি হাত ঘুরতে ঘুরতে নিউ-ইয়র্কের আর্ট কলেকটর গ্লেন কোভের ও পরে হার্বার্ট লি প্র্যাটের হাতে আসে। প্র্যাট সাহেব তাঁর সংগ্রহের ছবিগুলি আমহার্স্ট কলেজকে দিয়ে দিলেও যুবতীর প্রতিকৃতিটি তাঁর কাছে ছিল। ছবিখানির শিল্পীর নাম জানা যায়, জন ভ্যাণ্ডারলিন কিন্তু প্রতিকৃতিটি কার? যুবতী কে? শেষ পর্যন্ত ছবিখানি শনাক্ত করা গিয়েছিল। থিওডোসিয়া অ্যালস্টন বার।

কিন্তু থিওডোসিয়া বা 'পেট্রিয়ট' জাহাজের কি হলো, তারা কোথায় কি ভাবে অদৃশ্য হলো তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি। একাধিক জলদস্যু বিভিন্ন সময়ে একই মহিলাকে হত্যা করতে পারে না। থিওডোসিয়া নিহত হলেও জাহাজ কোথায় গেল? এর উত্তর বারমুডা ট্র্যাঙ্গল দিতে পারে কিন্তু সে তো কথা বলে না।

৪

সেই শেষ! ক্যাপটেন জনসন ব্লেকলি এবং তাঁর রণতরী 'ওয়াস্প'-এর আর কোনো খবরই পাওয়া গেল না।

এবার ইউ এস নেভি?

রহস্যের পর রহস্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার নৌবাহিনীর একখানা জাহাজ ঐ রহস্যময় ত্রিকোণের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল! আর সেই জাহাজের কথা বলতে গেলে আমেরিকার নৌবাহিনীর একজন সেরা বীরের কথা বলতে হয়। এই বীরের নাম তখন আমেরিকার নাগরিকদের মুখে মুখে ঘুরত। ব্রিটেনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে ইনি কয়েকখানা দুরন্ত ব্রিটিশ জাহাজকে ঘায়েল করেছিলেন।

সেই নৌ-বীরের নাম জনসন ব্লেকলি।

১৮১১ সালে যুবক ব্লেকলিকে ইউ এস নেভির একখানা জাহাজের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। এই যুবা বয়সেই জনসন নৌ-বিভাগে নাম করেছিল আর সে তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

জাহাজখানা নতুন, নাম 'ওয়াস্প'। ব্রিটিশ-মার্কিন যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের 'রেনডিয়ার' নামে একটা যুদ্ধ জাহাজ অ্যাটলান্টিকে মার্কিনদের নাস্তানাবুদ করছিল। জাহাজ-খানাও ছিল দারুণ। মার্কিন নৌবাহিনী মোটেই সুবিধে করতে পারছিল না।

এসব হলো ১৮১৪ সালের কথা। 'রেনডিয়ার'কে ঘায়েল করবার জন্যে জনসন ব্লেকলির ডাক পড়ল। জনসন কর্তৃপক্ষের সম্মান রক্ষা করল। জুন মাসে জনসন ব্রিটিশ রণতরী তচনচ করে ছাড়ল, তার আর নড়বার শক্তিটুকু রইল না।

সারা আমেরিকায় জনসন ব্লেকলির নাম ছড়িয়ে পড়ল, লোকের মুখে মুখে তার নাম ঘুরতে লাগল তারপর সেই বছরেই শীতের আরম্ভে যখন গাছের পাতা ঝরছে সেই সময়ে একদিন শোনা গেল জনসন ব্লেকলি তার জাহাজ সমেত নিরুদ্দেশ। কোনো অজুহাত নেই, কোনো কারণ নেই, কোনো সূত্র নেই। বেমালুম লোপাট যাকে বলে। শুধু জাহাজ ও জনসন নয়। সেই সঙ্গে জাহাজের সকলেই।

ইউ এস নেভি এমন কি শত্রুপক্ষ ব্রিটিশ নেভিও জনসন ব্লেকলিকে ও তার জাহাজকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল কিন্তু কোনো সূত্রই পাওয়া যায় নি, আজ পর্যন্ত রহস্যের সমাধানও হয় নি।

জনসন ব্লেকলির জীবন আরম্ভ হয়েছিল নাটকীয়ভাবে। জনসনের বাবা তার মা এবং একটি সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে ইংলণ্ড থেকে ১৭৮২ সালে কোনো একদিন যখন জাহাজে উঠে বসলেন তখন জনসন শিশু। তার বয়স এক বছর।

ওদের জাহাজ ভিড়বে সাউথ ক্যারোলিনার চার্লসটন বন্দরে কিন্তু জাহাজ ভেড়বার ঠিক আগেই জনসনের মা এবং শিশু ভাইটি মারা গেল। চারজন যাত্রা করেছিল, পৌঁছল দু'জন।

জনসনের বাবা বাচ্চাকে নিয়ে চার্লসটনে বছরখানেক ছিলেন তারপর তিনি উইলমিংটন শহরে চলে যান। সেখানে কি একটা ব্যবসা আরম্ভ করেন। ব্যবসা ক্রমশ জমে উঠতে থাকে। অবস্থা ফিরে যায়। জনসন বড় হতেই বাবা তাকে নর্থ ক্যারোলিনার বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপেল হিল-এ পাঠালেন। জনসনের বয়স তখন ষোল পার হয়েছে। গণিত, জরিপ আর নৌবিদ্যায় জনসনের দারুণ আগ্রহ বিশেষ করে নৌবিদ্যায়।

বেচারীর ভাগ্য খারাপ! পড়াশোনা শেষ হবার আগেই বাবা মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর যে সম্পত্তি তার হাতে এসেছিল তাও অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল। কাঠের বাড়ি ও বাড়িতে সঞ্চিত অর্থ ও অন্যান্য কিছু মূল্যবান সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তাই কথায় বলে দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হলো। মিডশিপম্যানরূপে জনসন ইউ এস নেভিতে ভর্তি হলো। তার পারিবারিক বন্ধু ও তার গার্জেন এডওয়ার্ড জোনস তাকে পড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু জনসন তার গার্জেনের অর্থ সাহায্য নিতে রাজী হয় নি।

ইউ এস নেভির তখন সবে আরম্ভ। নৌবাহিনী গড়ে তোলবার জন্যে সরকার সবে

হাত দিয়েছে এবং এইসবই হয়েছিল তদানীন্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামসের উদ্যোগে। তিনি বুঝেছিলেন যে দেশের দুই দিকে দুই বিরাট সমুদ্র। উপযুক্ত নৌ-বাহিনী ছাড়া দেশকে রক্ষা করা অসম্ভব। নৌবাহিনী ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের জন্যও জাহাজ তৈরি করতে হবে। তিনি সেদিকেও মন দিলেন।

তখনও সমুদ্রে জলদস্যুর অবাধ বিচরণ। তাদের থামাতে না পারলে সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালান অসম্ভব। তাদের গতি রোখবার জন্যেও নৌবাহিনীর জরুরী প্রয়োজন।

এই নৌবাহিনীতেই মনের মতো কাজ পেয়ে গেল সাহসী কিশোর মিডশিপম্যান জনসন ব্লেকলি। সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে সে ভালবাসে সেই সঙ্গে তার নতুন ও প্রিয় দেশকে রক্ষা করার কাজেও সে নিজেকে লাগাতে পারবে।

জনসন নেভিতে ভর্তি হয়েছিল ১৮০০ সালে তখন ইউ এস নেভির জাহাজ ছিল মোট তিরিশখানা। জনসনের ডিউটি পড়ল 'প্রেসিডেন্ট' নামে একটি রণতরীতে। রণতরীতে কামান ছিল ৪৪টি আর সেই রণতরী তখন ভূমধ্য সাগরে পাহারা দিচ্ছিল। এটি ছিল কমোডোর রিচার্ড ডেল-এর ফ্ল্যাগশিপ। সমুদ্র যুদ্ধে তাঁর ছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন।

এঁরই কমোডোরের অধীনে জনসন নৌযুদ্ধের কলাকৌশল ও সমুদ্রবিদ্যা শিখতে লাগল। প্রথম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হলো। ট্রিপোলির সঙ্গে কি একটা যুদ্ধ হচ্ছিল। কমোডোর ডেল সেই রণক্ষেত্রে জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধটা চলছিল পাইরেট-দের সঙ্গে। ১৮০৫ সালে পাইরেটদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত ট্রিপোলি যুদ্ধে জনসন তখন বেশ কয়েকবার অংশ গ্রহণ করেছিল।

ট্রিপোলির যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জনসনকে পাঠানো হলো আটলান্টিক সমুদ্রের উপকূলে। যে সব জাহাজ উপকূল পাহারা দিচ্ছিল তারই একটিতে জনসনের ডিউটি পড়ল। ১৮০৭ সালে সে হলো লেফটেনান্ট জনসন ব্লেকলি এবং একটি জাহাজের প্রথম কর্তৃত্ব দেওয়া হলো ১৮১১ সালে। জাহাজটির নাম 'এনটারপ্রাইজ'। চারমাস পর সে উন্নীত হলো 'কমাণ্ডার্ণ্ট'-এর পদমর্যাদায়।

১৮১২ সালে অর্থাৎ যে বছর থিওডোসিয়া বার সমেত পেট্রিয়ট জাহাজ ভ্যানিস হয়ে গেল সেই বছর ব্রিটেনের সঙ্গে আমেরিকার আবার নতুন করে যুদ্ধ বাধল। ১৮ জুন তারিখে মার্কিন কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষণা করল।

জনসন হলেন তখন 'ওয়াস্প' নামে রণতরীর কমাণ্ডার্ণ্ট। ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজ দেখলেই সেগুলি ধ্বংস করার ভার দেওয়া হলো জনসনকে। একটা রণতরীর পুরো ভার পেয়ে জনসন ব্লেকলি খুব খুশি। সে তার জাহাজের নাবিকদের এতদূর পর্যন্ত সুশিক্ষিত করে তুলল যে তার জাহাজের মতো দক্ষ নাবিক আর কোনো জাহাজে

ছিল না তাছাড়া মার্কিন নৌবহরের অন্যতম সেরা কমাণ্ডাণ্টরূপে জনসনের নামও তখন ছড়িয়ে পড়েছে।

ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ যখন আরম্ভ হলো তখন গ্রেট ব্রিটেনের হাতে যুদ্ধপোযোগী জাহাজ ছিল আট'শ, অবশ্য ছোট বড় মিলিয়ে। আর আমেরিকার ছিল মাত্র সতেরটি। আরও কয়েকখানা ছিল কিন্তু সেগুলো গভীর সমুদ্রে যাবার উপযোগী ছিল না। তবে আমেরিকার ছিল জনসনের মতো বেশ কিছু সুদক্ষ কমাণ্ডাণ্ট যেজন্য এই নবীন নৌবহর ব্রিটিশ রণতরীকে ভয় পায় নি।

'ওয়াস্প' নামে আমেরিকার আরও একখানা জাহাজ ছিল কিন্তু কিছুদিন আগে একটা ব্রিটিশ রণতরীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ধরা পড়ে। সে জাহাজখানা আর উদ্ধার করা যায় নি। নতুন ওয়াস্প দিয়ে তার স্থান পূরণ করা হয়। ক্যাপটেন জনসন ব্লেকলির পরিচালনায় এই নতুন ওয়াস্প ব্রিটেন আমেরিকার নৌযুদ্ধে ইতিহাস রচনা করে।

এই নতুন ওয়াস্প জাহাজে বাইশটা কামান ছিল। অফিসার ও সাধারণ নাবিক নিয়ে লোকবল ছিল মোট ১৭৩। ব্রিটিশ, স্প্যানিশ, ফরাসি ও মালয় জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াইয়ের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাদের ছিল তাছাড়া এরা নিজের নিজের কাজ জানত উত্তমরূপে এবং এদের সাহসের অভাব ছিল না। সর্বোপরি ছিল একজন অভিজ্ঞ সাহসী ও চৌকস ক্যাপটেন।

এ হেন ক্যাপটেনের অধীনে ওয়াস্প রণতরীর বিজয় অভিযান আরম্ভ হলো। নিজের সমুদ্রের সীমানা ছাড়িয়ে ওয়াস্প ব্রিটিশ জাহাজের সন্ধানে দূর দূর সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যদিও তার ওপর নির্দেশ ছিল বাণিজ্য জাহাজ ঘায়েল করা কিন্তু মাঝে মাঝে যুদ্ধ জাহাজও এসে পড়ত বৈকি রণং দেহী ভাব নিয়ে এবং লড়াইও হতো।

কিন্তু আক্রমণকারীদের পক্ষে ওয়াস্পের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল ছিল। ওয়াস্প একের পর এক ব্রিটিশ জাহাজ ঘায়েল করতে লাগল, দু-একটাতে অক্ষত দেহে বন্দী করে আমেরিকায় নিয়ে এলো।

ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে জনসন ও ওয়াস্প সম্বন্ধে একটা ভীতি জন্মে গেল।

'রেনডিয়ার' নামে একটা ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ প্রথমেই ঘায়েল করে আটলাণ্টিকের উভয় পারে জনসন ব্লেকলি খ্যাতনামা হয়ে গেল। এরপর 'অ্যাভন' নামে একখানা জাহাজকে জনসন ডুবিয়ে দিলো। 'আটলাণ্টা' নামে একখানা জাহাজকে বন্দী করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলো।

নিজে সে তখন ওয়াস্প নিয়ে আটলাণ্টিকে পাহারা দিচ্ছে। এবং আশ্চর্যের বিষয় এমন যে দুর্দান্ত জাহাজ যে প্রতিদিন সংবাদ রচনা করছে একদিন তারই কোনো

সংবাদ পাওয়া গেল না। কেউ তার কোনো খবর দিতে পারল না।

শেষ খবর দিয়েছেন 'অ্যাডোনিস' নামে সুইডেনের একটি জাহাজ। অ্যাডোনিস জাহাজে ছিল দুজন আমেরিকান লেফটেনাণ্ট। লেফটেনাণ্ট দুজনকে একটি ব্রিটিশ জাহাজ থেকে অ্যাডোনিস জাহাজে বদলি করা হয়েছিল।

অ্যাডোনিস-এর সঙ্গে ওয়াস্প-এর যখন দেখা হয়েছিল তখন অ্যাডোনিসের ক্যাপ-টেন সেই দুজন আমেরিকান লেফটেনাণ্টকে ওয়াস্প জাহাজে তুলে দিলো আমে-রিকান দুজন আডোনিসের ক্যাপটেনকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়াস্প জাহাজে উঠলো। সাউথ ক্যারোলিনার কোনো বন্দরে ওয়াস্প ভিডবে শোনা গিয়েছিল। পরস্পরের সৌজন্য বিনিময়ের পর উভয় জাহাজই ছেড়ে দিলো।

অ্যাডোনিস জাহাজের ক্যাপটেন পরে বলেছিলেন যে ওয়াস্প জাহাজকে দক্ষিণ-পশ্চিম অর্থাৎ মধ্য আটলাণ্টিকের দিকে যেতে তিনি দেখেছিলেন। মধ্য আটলাণ্টি-কের মধ্যেই তো সেই বিভীষিকার রাজ্য!

সেই শেষ! এরপর ক্যাপটেন জনসন ব্লেকলি এবং তাঁর ওয়াস্প জাহাজের আর কোনো খবরই পাওয়া যায় নি।

প্রথম ওয়াস্প জাহাজ যেখানা ব্রিটিশরা দখল করে নিয়ে নিজেরা চালাচ্ছিল সেই জাহাজখানাও ঐ একই বছর সমুদ্রের বুকে কোথায় হারিয়ে যায়। তারও কোনো খবর পাওয়া যায় নি।

অনেক রহস্যই আজও রহস্য। এই প্রথম একখানা সরকারী জাহাজ ভ্যানিশ হয়ে গেল। শুধু সরকারী নয়, জঙ্গী জাহাজ, আমেরিকার নৌবাহিনীর রণতরী, যার কমাণ্ডাণ্ট হলো আনাড়ি কেউ নয়, রীতিমতো 'সি-ডগ' একজন, সুশিক্ষিত ও দুঃসাহসী। কিন্তু এরা সব যায় কোথায়? সমুদ্র এদের বেমালুম গিলে ফেলে? নাকি একটা দশ পয়সার মতো টুপ করে জলে ডুবে যায়? ওয়াস্প জাহাজটি অদৃশ্য হওয়া কোনো ঘটনা নয়, আরও অনেক জাহাজ, বিমান অথবা জাহাজের সমস্ত নাবিক অদৃশ্য হয়েছে। সবেরই পশ্চাতে দুর্ভেদ্য রহস্য। পৃথিবীর তিনভাগ জলের মধ্যে যে সব রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে 'মেরি সিলেস্ট' জাহাজের রহস্য অন্যতম। তাকে নিয়ে আজও অনেক জল্পনা কল্পনা।

১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। একদিন দেখা গেল অ্যাজোরস দ্বীপ এবং পর্তুগালের মধ্যে কোনো এক জায়গায় জাহাজখানি ভাসছে। বারমুডা ট্র্যাঙ্গল থেকে দূরে জাহাজখানি পাওয়া গেলেও এর জন্যে বারমুডা ট্র্যাঙ্গলের নাম যুক্ত করা হয় কারণ এই এলাকাটি 'বারমুডা ট্র্যাঙ্গল একসটেনসন' (যার নাম লিখো অফ দি লস্ট)

হিসেবে ধরা হয়।

এই পরিত্যক্ত জাহাজ 'মেরি সিলেস্ট' ঘিরে গত এক শতাব্দী ধরে এত কাহিনী প্রচলিত রয়েছে যে কোনটি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা তা নির্ধারণ করা কঠিন। রহস্য সমাধানের প্রচেষ্টায় যেমন কিছু সবল সমাধান উপস্থিত করা হয়েছে তেমনি প্রচলিত রয়েছে কিছু জটিল সমাধান।

মেরি সিলেস্ট বড একটা জাহাজ নয়, ১০৩ ফুট লম্বা, ওজন ২৮২ টন। জাহাজখানি আবিষ্কার করে 'ডাই গ্রেসিয়া' জাহাজের ক্যাপটেন মুরহাউস। এই দুটি জাহাজ গত মাসের গোডায় নিউইয়র্ক বন্দরে একত্রে মাল বোঝাই করে। মেরি সিলেস্ট বন্দর ছাডে ৭ নভেম্বর ১৮৭২, যাবে ইটালির জেনোয়া বন্দরে।

'ডাই গ্রেসিয়া' বন্দর ছাডে ১৫ নভেম্বর ১৮৭২, গন্তব্য বন্দর জিব্রাল্টার। মেরি সিলেস্টের ক্যাপটেনের নাম হলো বিগ্রস আর গ্রেসিয়ার ক্যাপটেন হলেন মুর হাউস।

মাসখানেক পরে এবং জিব্রালটার পৌঁছতে যখন আরও ৫৯০ মাইল বাকি সেই সময়ে ক্যাপটেন দূর থেকে মেরি সিলেস্টকে চিনতে পেরে বিস্মিত হলেন কারণ এত-দিনে জাহাজটার তো জিব্রালটার ছাডিয়ে যাবার কথা! এখানে ও কি করছে?

কাছে এসে দেখেন জাহাজের সব পাল খাটানো রয়েছে, পালগুলি বাতাসে ফুলেও রয়েছে কিন্তু নির্দিষ্ট পথের দিকে তো যাচ্ছে না, কেমন যেন এলোমেলো তার গতি। কয়েকজন লোক বোঝাই করে ক্যাপটেন মুরহাউস একখানা নৌকো নামিয়ে দিলেন। ওরা মেরি সিলেস্ট জাহাজে উঠে দেখে আসুক ব্যাপারটা কি?

ডাই গ্রেসিয়া জাহাজের এই লোকগুলির জানা ছিল যে মেরি সিলেস্ট জাহাজে ক্যাপটেন ব্রিগস ব্যতীত তাঁর স্ত্রী ও কন্যা আছেন এবং আটজন নাবিক আছে। কিন্তু জাহাজে উঠে ওরা জনমনিষ্যির দেখা পেল না। সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার তো! ওরা গেল কোথায়? জাহাজের লাইফবোটও নেই।

সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার! ডাই গ্রেসিয়া জাহাজ থেকে যারা মেরি সিলেস্ট জাহাজে উঠে এসেছিল তারা দেখল যে জাহাজটির কোনো ত্রুটিও নেই, কোথাও কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা যান্ত্রিক গোলযোগ হয় নি। নাবিক থাকলে জাহাজ এখনি আবার সমুদ্রে চালানো যেতে পারে।

জাহাজে যে কোনো মারামারি হয়েছিল, জলদস্যুরা জাহাজ আক্রমণ করেছিল অথবা নাবিকরা বিদ্রোহী হয়েছিল তার কোনো প্রমাণই কোথাও দেখা গেল না।

সব কিছু যথাস্থানে রয়েছে। সঞ্চিত খাদ্য, পানীয় জল এবং জাহাজ বোঝাই ১৭০৫ পিপেভর্তি অ্যালকোহল রয়েছে। রান্না করা খাবার প্রস্তুত, একটু পরেই হয়তো

নাবিকেরা আহারে বসত, কফিরও সরঞ্জাম রয়েছে, কেউ বোধহয় দাড়ি কামাতে যাচ্ছিল, ক্ষুর ও সাবান আয়নার সামনে সাজানো রয়েছে, একজন বোধহয় কাশির ওষুধ খেতে যাচ্ছিল। ওষুধের শিশিটা ছিপিখোলা অবস্থায় রয়েছে, পাশে পানীয় জলের একটি গেলাসও রয়েছে।

ক্যাপটেনের পত্নী মিসেস ব্রিগস বোধহয় সেলাই করছিলেন। সেলাইকলে শিশুর একটি জামা লাগানো রয়েছে। মেসিনে লাগাবার জন্যে কিছু তেল একটি পাত্রে রাখা আছে। সেলাই করবার সময় আঙুলে পরবাব একটি টুপিও রয়েছে।

জাহাজের ডেকে কিছু কাচা কাপড় শুকোচ্ছে। জাহাজের মেট তার ঘবে বসে একখানি কাগজে বসে হিসেব লিখছিল। হিসেব শেষ হয় নি।

জিনিসপত্র যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল এবং যেভাবে সাজানো রয়েছে তা দেখে মনে হয় সমুদ্র শান্ত ছিল। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় নি বা ঝড়তুফানও ওঠে নি।

জাহাজেব নাবিকেরা বিদ্রোহ করে ক্যাপটেন ও তার পত্নী সন্তানকে হত্যা করে মৃত-দেহ জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেবা পালিযে গেছে? তার কোনো প্রমাণ নেই। ক্যাপ-টেনেব ঘরে ক্যাশ বাক্স কেউ স্পর্শ করে নি। একটি বাক্সে মিসেস ব্রিগসের কিছু অলংকার ছিল। সেগুলি কেউ ছোয় নি। আর নাবিকেরা যদি বিদ্রোহ করেও থাকে তারা জাহাজ না নিয়ে চলে গেল কেন।

নাবিকেরা যদি পালিয়েও থাকে তাহলে তারা যাবে কোথায়? পরে তাদের কোনো জাহাজ বা বন্দরে দেখা যাবে তো? কিন্তু তারা সবাই রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য।

ডাই গ্রেসিয়া জাহাজের ক্যাপটেন মুরহাউস তার জাহাজের সেকেণ্ড মেটকে নিয়ে স্বয়ং মেবি সিলেস্ট জাহাজে উঠে এলেন। দুজনে জাহাজখানা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলেন।

ক্যাপটেনের ঘবে একটা তলোয়ার পাওয়া গেল। তলোয়ারের গায়ে রক্তের ক্ষীণ দাগ। বক্তের দাগ? নাকি মরিচা? মদেব দাগও হতে পারে নাকি? তলোয়ারটি খাপে বদ্ধ ছিল।

জাহাজের রেলিঙের একদিকে কে যেন কুঠার দিয়ে আঘাত করেছে বলে মনে হলো। তবে আঘাত জাহাজে মাল বোঝাই করার সময়ও হতে পাবে। কাছে নাকি কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে ছিল।

জাহাজের হাল পরীক্ষা করবার সময় দেখা গেল যে জলের ওপরে খানিকটা অংশ কে যেন কেটে নিয়েছে। কোথাও আঘাত লেগে সেই অংশটি কি ভেঙে গেছে নাকি মেরামত করার জন্যে সেই অংশটুকু কেটে নেওয়া হয়েছে? সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না।

ক্যাপটেনের ঘরে তার টেবিলে জাহাজের লগবুকটি দেখা গেল। ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত লগবুকে রোজনামচা লেখা আছে। একটি স্লেটে ২৫ নভেম্বর ১৮৭২ তারিখ সকাল পর্যন্ত কিছু লেখা আছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় ডাই গ্রেসিয়াস কর্তৃক মেরি সিলেস্টকে পাওয়া গিয়েছিল ৫ ডিসেম্বর তারিখে। মাঝে দশ দিনের কোনো খবরই নেই।

লগবুক দেখে জাহাজের অবস্থান জানা যায়। জাহাজটি তখন ছিল ৩৬°৫৬´ নর্থ ল্যাটিচিউড এবং ২৭°২০´ পশ্চিম লঙ্গিচিউডে। পরিত্যক্ত জাহাজটি পাওয়া গিয়েছিল ৩৮°২০´ নর্থ ল্যাটিচিউড এবং ১৭°১৫´ পশ্চিমে লঙ্গিচিউডে। প্রায় চার'শ কুড়ি মাইল ভেসে এসেছে! এটাও যেন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা।

অক্ষত একটা গোটা জাহাজকে এইভাবে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না। ডাই গ্রেসিয়ার ক্যাপটেন মেরি সিলেস্টকে জিব্রাল্টারে আনবার জন্যে তাঁর জাহাজ থেকে কিছু নাবিক মেরি সিলেস্ট জাহাজে নামিয়ে দিলেন।

ঐ নাবিকেরা মেরি সিলেস্টকে জিব্রাল্টার বন্দরে নিয়ে এলো। জাহাজটি এইভাবে উদ্ধার করার জন্য ক্যাপটেন মুরহাউস যে পারিশ্রামিক দাবি করেছিলেন সে বাবদ তাঁকে ১৭০০ পাউণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু মেরি সিলেস্টকে জিব্রাল্টার বন্দরে নিয়ে আসার পর জাহাজটির রহস্য সম্বন্ধে অনেকে কৌতূহলী হলে। নানা রকম কল্পনা করতে লাগল। একজন তে বলল ডাই গ্রেসিয়া জাহাজের ক্যাপটেনই তো ব্যাপারটা ঘটিয়েছে। কি রকম? নিউ-ইয়র্ক বন্দরে এই দুটো জাহাজ একসঙ্গে মাল বোঝাই করেছিল। সেই সময়ে ডাই গ্রেসিয়া জাহাজের ক্যাপটেন কিছু লোককে মেরি সিলেস্ট জাহাজে চাপিয়ে দিয়েছিল। ডাই গ্রেসিয়ার ঐ লোকেরাই মাঝ সমুদ্রে মেরি সিলেস্টের ক্যাপটেনসহ সবাইকে হত্যা করে জলে ভাসিয়ে দিয়ে ক্যাপটেন মুরহাউসের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

জাহাজের রেজিস্টার, কিছু কাগজপত্র যা জাহাজে থাকা উচিত এবং বিল অব লেডিংগুলি পাওয়া যায় নি। সেক্সট্যাণ্ট এবং ক্রোনোমিটারও পাওয়া যায় নি।

অনুমান করা যেতে পারে যে অ্যালকোহলের পিপে ছাড়া মূল্যবান আরও কিছু মাল জাহাজে ছিল। সেগুলি ডাই গ্রেসিয়া জাহাজের ক্যাপটেন লুট করেছে। কিন্তু এও অনুমান মাত্র। লুটকরা মাল কোথায় গেল? অ্যালকোহল ছাড়া যদি অন্য কোনো মাল বোঝাই করা হয়ে থাকে তাহলে সে বিষয়ে মাল বোঝাই করার সময় নিউ-ইয়র্ক বন্দরের কেউ না কেউ জানবে। কিন্তু কেউ জানে না।

ইউনাইটেড স্টেটস সরকারের ট্রেজারির সেক্রেটারী উইলিয়ম এ রিচার্ড নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠিখানা ২৫ মার্চ ১৮৭৩ তারিখে প্রথম

পাতাতেই ছাপা হলো।

রিচার্ড লিখেছিলেন যে মেরি সিলেস্ট জাহাজের নাবিকেরা অ্যালকোহলের পিপে থেকে অ্যালকোহল বার করে নিয়ে পান করে মাতাল হয়ে ক্যাপটেন ব্রিগস, তাঁর পত্নী ও শিশুকে হত্যা করে এবং তারা নিজেরা উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোনো বন্দরে অন্য জাহাজে চেপে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে আছে অথবা অন্য কোনো কারণে সমুদ্রেই তাদের সলিল সমাধি হয়েছে।

রিচার্ডের মতে ২৫ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। রিচার্ডের এই চিঠি সরকারী ব্যাখ্যা বলে গৃহীত হয়। কিন্তু এই সরকারী ব্যাখ্যায় জাহাজের কাটা হাল সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। নাবিকেরা যে অ্যালকোহলের পিপে ভেঙেছিল তার প্রমাণ কোথায়? পিপেগুলি গুনতিতে ঠিক ছিল এবং জাহাজে উঠে গ্রেসিয়ার নাবিকেরা পিপেগুলি অক্ষতই দেখেছিল।

সেই সময়ে জিব্রাল্টার বন্দরে 'প্লিমাথ' নামে একটি জাহাজ ছিল। জাহাজের মাস্টার ক্যাপটেন শুবেল্ড মেরি সিলেস্ট সম্বন্ধে আগ্রহী হন। তিনি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে মত প্রকাশ করেন জাহাজের সকল আরোহী কোনো কারণে হঠাৎ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যয়তো তারা ভেবেছিল যে জাহাজটি এখনই ডুবে যাবে। এইভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তারা জাহাজ পরিত্যাগ করে।

কি করে জাহাজ পরিত্যাগ করল? ডাই গ্রেসিয়া জাহাজের নাবিকেরা প্রথমে যখন জাহাজে ওঠে তখন নাকি লাইফবোট দেখতে পান নি কিন্তু শুবেল্ড দেখেন যে জাহাজে লাইফবোট রয়েছে অতএব এক্ষেত্রে তারা অপর কোনো জাহাজে চেপে চলে যেতে পারে। সেই অপর জাহাজই হয়তো তাদের লাইফবোট নামিয়ে দিয়েছিল।

অথচ মেরি সিলেস্ট ডোববার কোনো লক্ষণই পরে দেখা যায় নি এবং এইভাবেই যদি নাবিকেরা অপর জাহাজে চেপে পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তারা গেল কোথায়। কোন্ বন্দরে নামল?

মেরি সিলেস্ট জাহাজের মালিক জে এইচ উইনচেস্টার আটলান্টিক পার হয়ে জিব্রাল্টারে এলেন। তিনি বললেন যে তাঁর জাহাজের নাবিকেরা বোধহয় ভেবেছে যে জাহাজে কোনো বিস্ফোরক পদার্থ আছে। ভাবতে পারে কারণ অ্যালকোহলের পিপে থেকে বাষ্প নির্গত হয়। সেই বাষ্প দেখে তারা একরম অনুমান করতে পারে। নাবিকেরা ভেবেছিল যে এখনি একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তারা পালিয়ে যায়।

তারপর সেই একই প্রশ্ন। তারা পালিয়ে গেল কোথায়?

নানারকম আজগুবী গুজবও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কেউ বলল একটি ডুবোজাহাজ

থেকে কামান দাগা হয়েছিল এবং বিষাক্ত গ্যাস জাহাজটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। প্রাণ বাঁচাবার জন্য জাহাজের আরোহীরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কেউ কেউ বলে বিরাট অক্টোপাস বা কোনো সামুদ্রিক প্রাণী জাহাজের আরোহীদের সংহার করেছে। চাঁদ, মঙ্গল বা অপর কোনো গ্রহ থেকে কোনো জীব এসে জাহাজেব মানুষদের নিজেদের গ্রহে ধরে নিয়ে গেছে। মনুষ্য নামক জীবকে তারা পরীক্ষা করে দেখবে।

নানা গুজব শোনা গেল, শোনা গেল নানা ব্যাখ্যা কিন্তু কোনোটাই তেমন গ্রহণযোগ্য হলো না। তবে একজন একটা কথা বললেন।

আটা ময়দার সঙ্গে অনেক সময় আরগট চূর্ণ মিশে যায়। এরকম হলে ও সেই আব গট চূর্ণ মিশ্রিত আটা ময়দার রুটি খেলে মানুষ নানারকম বিভীষিকা দেখে ও অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করতে থাকে। তিনি অবশ্য এই ব্যাখ্যা অনেক পরে দিয়েছিলেন তখন জাহাজের আটা ময়দা বা রুটি পরীক্ষা করবার কোনো উপায় ছিল না।

জাহাজের আরহীরা সেই বিষাক্ত রুটি খেয়ে পাগল হয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরকম ঘটনা বর্তমান কালে ফ্রান্সেও ঘটেছে।

উইনচেস্টার সাহেব তার জাহাজকে পরে জেনোয়া বন্দরে নিয়ে যান এবং এর পরও মেরি সিলেস্ট বেশ কয়েক বছর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত ১৮৮৫ সালে বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের নিচে কিউবা উপকূলে ধাক্কা লেগে জাহাজখানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। মূল রহস্যের কোনো সমাধান হলো না।

মেরি সিলেস্ট রহস্য উপলক্ষ করে কাহিনীকারেরা অনেক রহস্য কাহিনী লিখেছেন। অন্যতম হলেন আর্থার কনান ডয়েল। যখন তিনি এই কাহিনী লিখেছিলেন তখনও তিনি পাঠকমহলে অপরিচিত।

দি কর্নহিল ম্যাগাজিনের ১৮৮৪ জানুয়ারী সংখ্যায় তিনি এক কাহিনী লেখেন। কাহিনীর নাম 'জে হ্যাবাকুক জেফসনস স্টেটমেণ্ট'। জাহাজে একটি মেরি সিলেস্ট জাহাজের কাহিনী ছিল কিন্তু মেরি বানানটি ডয়েল অন্যভাবে লিখেছিলেন। এম এ আর ওয়াই এর বদলে লিখেছিলেন এম এ আর আই-ই।

৫

বিস্ফোরণ ? টর্পেডো ? অক্টোপাস ? অন্যগ্রহের জীব ? ফ্লাইং সসার ?

বেমালুম বিলীন ?

জাহাজরা সব যায় কোথায় ? সব জাহাজের কাহিনী লিখতে গেলে বই তো বিরাট হবেই, পাঠকদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। গত শতাব্দীতে তো অনেক জাহাজ রহস্যজনক-ভাবে অদৃশ্য হয়েছে, এই শতাব্দীতেও জাহাজরা সব কোথায় চলে যাচ্ছে। কে তার জবাব দেবে ?

১৯১৮ সাল। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে আসছে। ইউ এস নেভির কয়লাবাহী একটি জাহাজ, নাম 'ইউ এস এন সাইক্লপস'। জাহাজটি কয়লাবাহী অর্থাৎ কোলিয়ার হলেও ম্যাঙ্গানিজ বোঝাই করা হলো।

জাহাজটি দৈর্ঘ্যে ছিল ৫৪২ ফুট, মালবাহী জাহাজের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ। নেহাত ছোট নয়, ১৯৬০০ টনের জাহাজ।

মার্চ মাসের ৪ তারিখে জাহাজ বারবেডস বন্দর ছাড়ল। বারবেডস ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত বন্দর। এখানে ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়। জাহাজ যাবে উত্তর দিকে আমেরিকার পুব উপকূলে নরফোক বন্দরে। ইংলণ্ডে যেমন, আমেরিকাতেও নরফোক আছে কিন্তু সেই জাহাজ নরফোক পৌঁছল না

তখন যুদ্ধের সময়। শত্রুপক্ষের জাহাজকে ঘায়েল করবার জন্য সমুদ্রে মাইন পাতা থাকত। অনেকে অনুমান করল যে মাইনে ধাক্কা খেয়ে জাহাজখানি ডুবে গেছে। আবার কেউ বলল জার্মান সাবমেরিন টরপেডো মেরে জাহাজটি ডুবিয়ে দিয়েছে। কোনোটাই ঠিক নয়। জার্মানরা শত্রুপক্ষের কোনো জাহাজ ডুবিয়ে দিলে তারা তা সগৌরবে ঘোষণা করত তাছাড়া যে এলাকা থেকে জাহাজ নিরুদ্দেশ হয়েছে সেই এলাকায় জার্মানরা কোনো মাইন পাতে নি বা জার্মান সাবমেরিনও আসে নি। যুদ্ধের পর এ তথ্য জানা গিয়েছিল।

আর একটা কথা। জাহাজে মাইনের আঘাত লাগলে বা সাবমেরিন থেকে নিক্ষিপ্ত টরপেডো জাহাজকে মারলে সেই জাহাজ অন্তত জরুরী এস ও এস বার্তা পাঠাবার

সময় পায়। সাইক্লপস জাহাজে বার্তা আদানপ্রদানের জন্য অয়ারলেস যন্ত্র বসানো ছিল।

জাহাজ ডুবতে থাকলে কিছু লোক লাইফবোটে চেপে বা অন্য কিছু অবলম্বন করে পালাবার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে সেরকম কোনো লোকের সন্ধান পাওয়া যায় নি। জাহাজ ডুবে যাবার পর কিছু ভগ্নাংশ সমুদ্রে ভাসতে দেখা যায়। সেরকম কিছু পাওয়া যায় নি।

তাহলে কি ঝড়ের প্রবল টানে দিকভ্রান্ত হয়ে জাহাজটি দূরে কোথাও চলে গেল? এবং এখনও সে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে? না। সেরকম হবার কথা নয় কারণ জাহাজখানি পুরনো নয় বেশ মজবুত, যন্ত্রপাতিও উত্তম অবস্থায় ছিল। জাহাজের ক্যাপটেন জর্জ ডব্লু ওরলি সুদক্ষ আটাশ বছরের অভিজ্ঞ, জাহাজে ৩০০ জন লোক ছিল। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে একজনও কি বাঁচল না?

জাহাজটির জন্য মার্কিন নৌহবর অনেক অনুসন্ধান করে জাহাজটির কোনো সন্ধান করতে পাবল না। প্রেসিডেন্ট উইলসন বললেন: জাহাজখানির যে কি হয়েছে তা জানেন একমাত্র ঈশ্বর ও সমুদ্র।

লিটারারি ডাইজেস্ট-এর মতো একটি খ্যাতনামা পত্রিকা এমন কথাও বলেন যে বিরাট প্রাণী স্কুইড সমুদ্র থেকে উঠে এসে জাহাজখানাকে সমুদ্রের ভেতরে টেনে নিয়ে গেছে।

তবে কি আভ্যন্তরীণ কোনো বিস্ফোরণ ঘটেছিল? বেতার ব্যবস্থাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? এবং জাহাজখানি পরে ডুবে গিয়েছিল? এভাবে জাহাজ ডুবে গেলে ভাসমান কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। অথচ যে পথে জাহাজ যাবার কথা সেই পথ এবং দুই দিকের ছোট ছোট দ্বাপগুলি তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হয়েছিল কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

কেউ বললেন জাহজেটির মাথা ভারি ছিল। ম্যাঙ্গানিজ দ্বারা জাহাজটির খোল সম্পূর্ণ ভর্তি ছিল না। খোলের অপর পার্শ্বে ম্যাঙ্গানিজ সরে গিয়ে থাকতে পারে যার ফলে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটে এবং জাহাজখানি সম্পূর্ণ ভাবে ডুবে থাকতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মানুষ বা জাহাজের অংশ বিশেষ সমুদ্রের ওপরে ভেসে ওঠে না

মার্কিন নৌবহরের নেভাল ইনটেলিজেন্স বিভাগ জাহাজখানি নিখোঁজ হওয়ার মূলে নিম্নোক্ত একটি কারণকে দায়ী করে:

১। জাহাজের নাবিকেরা বিদ্রোহী হয়ে জাহাজটি দখল করে নিয়ে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করে।

২। রায়ো ডি জেনিরোর আমেরিকান কন্সাল জেনারেল যিনি সাইক্লপস জাহাজে যাত্রী ছিলেন তিনি জার্মানদের সমর্থক ছিলেন। তিনিই হয়তো কোনোভাবে জাহাজখানি জার্মানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

৩। জাহাজের ক্যাপটেন ওরলি জার্মানিতে জন্মেছিলেন। তিনিই হয়তো জাহাজখানি জার্মানদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন অথবা জার্মান সবমেরিনের আক্রমণ দাবা জাহাজখানি ডুবিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন।

৪। জার্মান সাবমেরিন থেকে নিক্ষিপ্ত টরপেডো জাহাজখানি ডুবিয়ে দিয়েছিল।

৫। জাহাজে ম্যাঙ্গানিজ ছিল। বিশেষ অবস্থায় ম্যাঙ্গানিজে আগুন ধরে যায় এবং বিস্ফোরণ ঘটে। এই রকম কোনো বিস্ফোরণের ফলে জাহাজখানি ডুবে যায়।

৬। কোনো গুরুতর যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটেছিল।

৭। জাহাজখানি সহসা ভেঙে দু টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

সাইক্লপস নিয়ে জল্পনাকল্পনার আজও শেষ হয় নি। রেডিও সমন্বিত একটি বড় জাহাজ যা কোনো বিপদ সংকেত না পাঠিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল। বড়ই আশ্চর্য।

পরে চেসাপিক উপসাগরে সমুদ্রের নিচে কয়েকটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে কোনো একটি সাইক্লপস জাহাজের কিনা তা বোঝা যায় নি।

একজন গবেষক ঐ সময়ের খবরের কাগজের পুরনো ফাইল দেখবার সময় আবিষ্কার করেন যে, যে তারিখে সাইক্লপস অদৃশ্য হয়েছে সেই তারিখে চেসাপিক উপসাগরে প্রবল ঝড় তুফান হয়েছিল, তারই ফলে সাইক্লপস ডুবে যায়। এবং পরে সমুদ্রের নিচে যে ধ্বংসাবশেষগুলি পাওয়া গেছে তারই একটি সাইক্লপস জাহাজের।

হাল আমলের কথাই ধরা যাক। বেশি দিনের কথা নয়। ১৯৫০ সালে ৩৫০ ফুট দীর্ঘ একটি মালবাহী জাহাজ আমেরিকার মিয়ামি বন্দর ছাড়ল। যাবে উত্তরে জর্জিয়ার সাভানা বন্দরে।

সাভানা বন্দরে পৌঁছে তিন'শ টন কীটনাশক পদার্থ জাহাজে বোঝাই করল। জাহাজটির নাম সানড্রা। সানড্রা এইবার যাবে দক্ষিণ আমেরিকায় ভেনেজুয়েলার পুয়েরটো ক্যাবেলো বন্দরে।

দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিল আবার সমুদ্রের ঢেউ কেটে দক্ষিণ দিকেই ভেসে চলল। জাহাজে ছিল আটাশ জন লোক এবং সেই তাদের শেষ যাত্রা। দক্ষিণ আমেরিকার বন্দরে সেই জাহাজ কোনোদিনই পৌঁছয় নি। কোন্ বন্দরে পৌঁছেছিল তাও কেউ জানে না। বারমুডা ট্রাঙ্গেলের আরও একটি বলি।

আরও হালের কথা। ১৯৫০ সালের ২১শে মার্চ 'অ্যানিটা' নামে জার্মান মালবাহী

১৩০০০ টনের জাহাজ ভারজিনিয়ার নিউপোর্ট নিউজ বন্দরে কয়লা বোঝাই করে জার্মানির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। জাহাজে ৩২ জন নাবিক ছিল। সেই জাহাজ মাঝপথ থেকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ তার কোনো খবর জানে না।

লয়েডস অফ লণ্ডনের একটি হিসেব থেকে জানা যায় যে অ্যানিটা নিরুদ্দেশের সময় থেকে বিগত দশ বছরের মধ্যে রহস্যজনকভাবে ৬০খানি জাহাজ ও ৯৩৫ জন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ। না, এরা কোনোদিন কোনো বন্দরে ফিরে আসে নি।

বারমুডা ত্রিকোণের ভেতরে 'পোর্টো নোকা' নামে একটি যাত্রীবাহী জাহাজ ফ্লোরিডার ট্যাম্পা থেকে কিউবার কিছুদূরে অবস্থিত আইল অফ পাইনস এবং গ্র্যাণ্ড কেম্যান আইল পর্যন্ত যাতায়াত করত অনেকটা বাস সারভিসের মতো।

মাঝে মাঝে অনেক দ্বীপ আছে। এইসব দ্বীপে যাত্রীরা জাহাজ থেকে নামে আবার ওঠে। পোর্টো নোকা তাদের যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন ছিল তবে এই ঘটনাটি হাল আমলের নয়, পঞ্চাশ ষাট বছর আগের কথা বলছি।

আইল অফ পাইনসে একজন চিত্রশিল্পী বাস করতেন, তাঁর নাম ছিল র‍্যাড মিলার। র‍্যাড মিলার ঐ জাহাজের একজন নিয়মিত যাত্রী ছিল। রং তুলি আর ক্যানভাস নিয়ে এ দ্বীপ সে দ্বীপ ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকত। আইল অফ পাইনস দ্বীপটি ভারি সুন্দর ছিল। নৈসর্গিক শোভা ছিল অপূর্ব। কিউবার ধনী অধিবাসীরা এই দ্বীপে বাগান বাড়ি তৈরি করেছিলেন। অবসর যাপন করতে তারা মাঝে মাঝে দ্বীপে আসতেন। বর্তমানে এই দ্বীপের চরিত্র বদলেছে। বাগান বাড়ি থাকলেও সেগুলি এখন অন্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে দ্বীপান্তরে দণ্ডিত আসামীদের এই দ্বীপে রাখা হয়।

১৯২৬ সালের কোনো একদিন অন্য দ্বীপে গিয়ে ছবি আঁকবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে র‍্যাড মিলার আইল অফ পাইনের জেটিতে পোর্টো নোকার জন্যে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল।

সকাল বেলা। সমুদ্রের হাওয়া বইছে। দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগছে না। দূরে যেন জাহাজ দেখা গেল। জাহাজ জেটির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

সরঞ্জাম ভর্তি ব্যাগ হাতে নিয়ে র‍্যাডও এগিয়ে চলল। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে গেল। তার চোখ গোল, বিস্ময়ে হতবাক। জাহাজটা যেন জ্বলছে।

কিন্তু সে বোধহয় ভুল দেখছিল। মায়াজাল? তাই হবে বোধহয়।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তারপর পরিষ্কার। পোর্টো নোকা জাহাজ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জেটির দিকে এগিয়ে আসছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজ জেটিতে ভিড়ল। জাহাজে ওঠানামার জন্যে হুড়োহুড়ি

পড়ে গেল। গোলমাল। জাহাজের পাইলট কাকে কি বলছে চিৎকার করে।

জাহাজ বেশিক্ষণ থামবে না। যারা নামবার তারা নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঠবার যাত্রীরা উঠতে লাগল। র‍্যাডও কয়েক কদম এগিয়ে গেল তারপর থেমে গেল।

কিছু আগে দেখা দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। না, সে এ জাহাজে যাবে না। তার মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে। ছবি আঁকিবার মন নেই। পরে একদিন যাবে এখন।

জেটি থেকে র‍্যাড মিলার নিজের কুঁড়ে ঘরে ফিরে এলো। সেদিন জাহাজে এক র‍্যাড মিলারই ওঠে নি। তাই সে যাত্রা র‍্যাড প্রাণে বেঁচে গেল। আশ্চর্যের ব্যাপার। পরবর্তী দ্বীপের দূরত্ব বেশি নয়। আকাশ ছিল পরিষ্কার, সমুদ্র ছিল শান্ত। পরবর্তী দ্বীপে পোর্টো নোকা পৌঁছয় নি।

পোর্টো নোকাকে আর কেউ কোনোদিন দেখে নি। সমস্ত নাবিক ও যাত্রীসমেত পোর্টো নোকা ভ্যানিশ হয়ে গেল।

এবার দিকপাল নাবিকের পালা

পৃথিবীর খ্যাতনামা নাবিকদের মধ্যে ক্যাপটেন জোশুয়া স্লোকামের নাম পুরোভাগে। তাকে বলা হয় আমেরিকার 'বেস্ট নোন সেলার।

তিনি কি করেছিলেন? এক মাস্তুল ওয়ালা পালতোলা ছোট একটি জাহাজে চেপে তিনি একা সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। ছেচল্লিশ হাজার মাইল পার হলেন, মরক্কোর কাছে জলদস্যুরা তাড়া করল, প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়লেন, ম্যাজেলান স্ট্রেট অঞ্চলে একদল অসভ্য জাতি তাঁর জাহাজ প্রায় আক্রমণ করেছিল কিন্তু তিনি তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন এবং প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন।

এই সুদীর্ঘ সমুদ্র পরিক্রমায় তিনি আরও কতবার কত বিপদে পড়েছিলেন। এক-বার তো সারগাসো সাগরে এক সপ্তাহ আটকেই রইলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে এলেন।

এ হেন একজন দুঃসাহসী, বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ নাবিককে কিনা বারমুডা ট্র্যাঙ্গল গিলে ফেলল?

সেই কাহিনীই বলছি:

জোশুয়া স্লোকাম নোভাস্কসিয়ার লোক। ব্রায়ারস আইল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম। এই দ্বীপের লোকেরা দুঃসাহসিক ধীবর, ক্ষিপ্ত সমুদ্র তুচ্ছ করে এরা মাছ ধরতে যায়। এদের আরও একটা খ্যাতি আছে। এরা ভালো জাহাজ তৈরি করতে পারে।

স্লোকামের এই দুটো গুণই ছিল। বালক বয়স থেকেই সে দুঃসাহসী ও দক্ষ নাবিক।

ষোলো বছর বয়সেই সে একা পৃথিবী প্রদক্ষিণের স্বপ্ন দেখত।

বয়প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে বৃহত্তর পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ল। একখানা জাহাজের পরিচালন ভার নিয়ে তিনি বিপদ সংকুল উত্তর আলাস্কা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এলেন। তখন তাঁর বয়স আর কতই বা!

এরপর স্যান ফ্রানসিসকো থেকে হনলুলু পর্যন্ত যাতায়াতকারী একটি জাহাজের ক্যাপটেন; আরও পরে চলে গেলেন ফিলিপাইন দ্বীপে। সেখানে স্থানীয় অধিবাসী-দের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করতে লেগে গেলেন। চুপ করে বসে থাকবার লোক নয়। চীন দেশে কি একটা কারবার করতেন। ক্রমশ সপ্ত সমুদ্রে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত নাবিক একডাকে জোশুয়া স্লোকামকে চিনত।

এইবার সময় উপস্থিত। পৃথিবীটা প্রদক্ষিণ করা যাক একা। একা নইলে মজা কিসের। বেড়াতে যদি হয় তো একাই ভালো। নিজের ইচ্ছেমতো চলা যায়, থামা যায়, ঘুমনো যায়, বাড়ি ফেরা যায়।

কথাটা প্রচার হয়ে পড়ল। স্লোকামকে যারা চিনত তারা বিশ্বাস করল একাজ যদি কেউ পারে তো স্লোকামই পারবে। অতএব জোশুয়া স্লোকাম একটা মজবুত জাহাজ তৈরি করতে লেগে গেলেন।

এক-মাস্তুলের পালতোলা ৩৬ ফুট একটা 'স্লুপ' জাহাজ তৈরি করলেন। নাম দিলেন 'স্প্রে'।

তারপর ১৮৯৭ সালের এক শুভক্ষণে উত্তর অতলান্তিকের বায়ুতে পাল তুলে দিয়ে যীশুনাম স্মরণ করে জাহাজ ছেড়ে দিলেন।

বন্দরে বন্দরে তাঁর চেনাজানা লোক। যে বন্দরেই যান সেই বন্দরেই বিপুল অভ্যর্থনা। ছেচল্লিশ হাজার মাইল সমুদ্রপথ অতিক্রম করে ১৮৯৮ সালে তিনি আবার স্বদেশে ফিরে এলেন।

'স্প্রে' আর স্লোকামের নাম লোকের মুখে মুখে।

এবার কিছুদিন বিশ্রাম দরকার। জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত তার বিকল হয়েছে বুঝি তাই এক গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকবেন। তারপর দেখা যাবে।

কিন্তু বিশ্রাম নেবার কি উপায় আছে? কত রকম লোক আসে, কত রকম অনুরোধ, কত রকম দাবি। কেউ বলে খবরের কাগজে তোমার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে প্রবন্ধ লেখো, কেউ বলে শহরে শহরে বক্তৃতা দাও, কেউ বলে আর কিছু, চায় স্বতন্ত্র কিছু। তারা পয়সার লোভ দেখায়।

এই নির্জন গ্রামে কোনোরকমে কয়েকটা দিন কাটিয়ে স্লোকাম একদিন তার স্প্রে

চালিয়ে নির্জনতর একটা দ্বীপে চলে গেলেন। এই দ্বীপের নাম গ্র্যাণ্ড কেম্যান, জ্যামাইকার অদূরে। এই দ্বীপে একদা জলদস্যুর আড্ডা ছিল।

জোশুয়া স্লোকাম নিষ্কর্মা হয়ে কয়েকটা বছর কাটালেন কিন্তু আর চুপ করে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। সমুদ্র তাকে হাতছানি দিচ্ছে। একান্ত সঙ্গী স্প্রে জাহাজ-খানা মেরামত করতে পাঠালেন। কারখানার লোকেরা বলল মেরামত করার কিছু নেই, জাহাজ অতি উত্তম অবস্থায় আছে, আর একবার পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে। তারা মোটামুটি ঝেড়েমুড়ে যথাস্থানে লুব্রিকেটিং তেল দিয়ে, ছোটোখাটো মেরামত করে, পেণ্ট লাগিয়ে স্লোকামকে জাহাজ ফিরিয়ে দিলো।

জাহাজখানা স্লোকাম মেরামত করতে পাঠিয়েছিলেন বোড অ্যাণ্ড্যাণ্ডের ব্রিস্টল বন্দরে হেরেসহফের কারখানায়। যদিও কেউ কেউ মন্তব্য করেছিল যে পৃথিবী পরিক্রমা করে এসে সে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে তথাপি উক্ত কারখানার মালিক "ন্যাট হেরেসহফে" বলেছিলেন যে মোটেই না, জাহাজ রীতিমতো মজবুত আছে এবং আর একবার পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে।

আর একজন অভিজ্ঞ নাবিক বলেছিল যে জাহাজ যাই হোক না কেন সে জাহাজের পাইলট যদি হয় জোশুয়া স্লোকাম তাহলে সমুদ্রের জল না থাকলেও স্লোকাম সেই জাহাজকে ঠিক ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ঝড়তুফান? স্লোকাম জাদু জানে। তার কাছে সব সমুদ্র, সব ঝড়, সব তুফান জব্দ। এ হেন জোশুয়া স্লোকামকে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল যেন গিলে ফেলল!

ব্রিস্টল থেকে একদিন জোশুয়া তার জাহাজখানি গ্র্যাণ্ড কেম্যান দ্বীপে নিয়ে এলো তারপর সেই দ্বীপের জেটি যার নাম মার্থাস ভাইনইয়ার্ড সেখান থেকে ১৯০৯ সালের ১৪ নভেম্বর অনুকূল পবনে পাল তুলে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে যাত্রা করলেন এবং সেই তাঁর শেষ যাত্রা। আর ফেরেন নি। কোথায় গেলেন কেউ জানে না।

জাহাজ ছাড়াবার সময় স্লোকাম নিজে পাইলটের হুইল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর, দৃষ্টি উজ্জ্বল আর স্বাস্থ্য? ছেলে ভিক্টর বলেছে যে বাবার এমন উত্তম স্বাস্থ্য সে আগে আর দেখে নি।

সেদিন পবন ছিল যেমন অনুকূল সমুদ্রও ছিল তেমনি শান্ত। অনুকূল পবন শান্ত সমুদ্রই হলো দুই সঙ্গীর অগস্ত্য যাত্রা।

কিন্তু কি হলো জাহাজখানার? আগুন লেগেছিল? নেভাবার তো উত্তম ব্যবস্থা ছিল? ঝড়ের মুখে পড়েছিল? সে রকম ঝড়ের কোনো রিপোর্ট তো পাওয়া যায় নি? আর তাই যদি হবে তাহলে তো অবশিষ্টাংশ কিছু ভেসে উঠবে?

দক্ষিণ আমেরিকা যাবার নাম করে স্লোকাম যদি আবার পৃথিবী ঘুরতে আরম্ভ করে থাকে ? বেশ। কিন্তু যাবে কোথায় ? কোনো না কোনো বন্দরে তাকে জাহাজ ভেড়াতে হবে তো ! কিন্তু তাদের তো সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। না জাহাজের, না মানুষটির।

রাত্রির অন্ধকারে কোনো বড় জাহাজ যদি 'স্প্রে'-কে ধাক্কা মেরে থাকে তাহলে ছোট জাহাজখানা উলটে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যেতে পারে। রাত্রে জাহাজে আলো থাকলেও নাকি পালের আড়ালে সে আলো ঢাকা থাকে। বড় জাহাজের নজরে সে আলো না-ও পড়তে পারে। সামুদ্রিক কাহিনীর সেরা লেখক আমেরিকার এড-ওয়ার্ড রো স্নো তাঁর 'মিস্টিরিয়স টেলস অফ দি নিউ ইংলণ্ড কোস্ট' বইতে লিখেছেন যে লেসার আন্টিলিস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত টার্টল আইল্যাণ্ডের কাছে অরিনেকো নদীর মুখে ৫০০ টনের একটি মেল স্টিমার ৩৭ ফুট দীর্ঘ স্প্রে জাহাজকে সজোরে ধাক্কা মারে, যার ফলে স্লোকাম সহ জাহাজটি ডুবে যায়।

কিন্তু 'স্প্রে' জাহাজে এমন কমজোর আলো থাকার কথা নয় যে আলো অন্ধকারেও বড জাহাজ থেকে দেখা যাবে না।

ম্যাসাচুসেটস এর গ্লস্টার শহরের নাবিকেরা স্লোকামকে বিদায় অভিনন্দন জানাবার সময় এমন একটি উজ্জ্বল আলো উপহার দিয়েছিল যে আলো রাত্রে জাহাজের পাল আলোকিত করে রাখত। অনেক দূর থেকে সেই আলোকিত পাল দেখা যেত। অবশ্য সেই আলো কোনো কারণে যদি নিভে গিয়ে থাকে তো আলাদা কথা।

জোশুয়া স্লোকাম ও তার জাহাজ 'স্প্রে' অন্তর্ধানের কোনো সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় নি। জনশ্রুতি ছিল যে পরে অরিনেকো নদীতে বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপে নাকি স্লোকামকে দেখা গিয়েছিল। জনশ্রুতি গুজবেরই নামান্তর।

'স্প্রে' বা স্লোকাম রহস্যের সমাধান করতে না পেরে একজন বললেন যে স্লোকামের বিবাহিত জীবন মোটেই সুখের ছিল না। স্ত্রীর ধারালো রসনা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে স্লোকাম নাকি গোপনে কোথাও সরে পড়ে লুকিয়ে আছে।

লুকিয়েই যদি থাকে তাহলে এমন বিখ্যাত একজন ব্যক্তি তার বিখ্যাত জাহাজখানি নিয়ে কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে ? সেও তো এক রহস্য !

৭ জানুয়ারি ১৯৫৮ মঙ্গলবার তারিখের নিউইয়র্ক টাইমস খবর দিচ্ছে : মিয়ামি (ফ্লোরিডা) জানুয়ারি ৬ (ইউ পি) প্রবল বায়ু বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ফ্লোরিডার দক্ষিণে একটি ৪৫ ফুট ইয়টে চারজন আরোহী সহ 'হারভে কনোভার' আজ নিখোঁজ হয়েছে।

কোস্ট গার্ডরা খবর দিচ্ছে যে সারাদিন অনুসন্ধানের ফলে এখান থেকে আশি মাইল উত্তরে জুপিটার ইনলেটের কাছে উক্ত ইয়েটের একটি লাইফবোট পাওয়া গেছে।

কোস্টগার্ড বলছে যে মিঃ কনোভারের দুই মাস্তুলওয়ালা ইয়ট গত বৃহস্পতিবার কি-ওয়েস্ট থেকে মিয়ামির দিকে যাত্রা করেছিল···

হারভে কনোভার ছিলেন ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী। নিউইয়র্কের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কনোভার-ন্যাসট পাবলিকেশন ইন্‌ক-এর তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট। ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথিবী বিখ্যাত দুখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একটির নাম 'ইয়টিং', অপরটির নাম 'অ্যাভিয়েশন এজ'।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কনোভার এয়ার কোরের একজন পাইলট ছিলেন এবং মিয়ামি থেকে ন্যাসো পর্যন্ত ইয়ট রেসে তিনি তিনবার জয়লাভ করেছিলেন।

তাঁর নিজস্ব একখানা অতি উত্তম ইয়ট ছিল। সেখানার তিনি নাম দিয়েছিলেন 'রেভোনক'। নিজের নাম কনোভারের অক্ষরগুলি উলটে দিলে রেভোনক হবে (Conover-Revonoc)।

তাঁর ইয়টখানার তুল্য উত্তম ইয়ট আমেরিকাতে কমই ছিল। দ্রুতগমী এই ইয়ট-খানি জলের উপর দিয়ে চলত 'জলের মতো'।

ইয়টখানিকে বলা হতো 'সেফেস্ট অ্যাণ্ড ফাইনেস্ট ক্র্যাফট অ্যাফ্লোট।'

এই রকম নির্ভরযোগ্য একটি ইয়ট নববর্ষের প্রারম্ভে বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের দক্ষিণে প্রবেশ করল, আর ফিরল না।

সেদিন ছিল বুধবার। ভোর থেকেই আকাশ পরিষ্কার। ঝড়ের কোনো পূর্বাভাস নেই। রেভোনকের যাত্রীরা ফ্লোরিডার কি-ওয়েস্ট জাহাজঘাটে সমবেত হয়েছেন। ক্যাপটেন কনোভারের স্ত্রী ডরোথি আছেন, তাদের ২৭ বৎসর বয়স্ক ছেলে লরেন্স আছে আর আছেন তাঁদের বন্ধু উইলিয়ম এবং মিসেস ফ্লুগেনম্যানস। এরাও নিউ-ইয়র্কে থাকেন।

ইয়টে উঠে মিসেস ফ্লুগেনম্যানস ঘাবড়ে গেলেন। তিনি এই ইয়টে চেপে সমুদ্রে যাবেন না, এ তো সমুদ্রে উলটে যাবে। শেষে কি তিনি ডুবে যাবেন নাকি? না তিনি কিছুতেই যাবেন না। শেষ মুহূর্তে তিনি নেমে গেলেন। স্বামী উইলিয়মের সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয় নি।

একটু পরেই হাঁসের মতো সাদা পাল মেলে ইয়ট সমুদ্রে ভেসে চলল। বুধবার কাটল, বৃহস্পতিবার কাটল, শুক্রবার কাটল, শনিবার এলো। এই কয়েক দিনের ভেতর যে কোনো বন্দর থেকে রেভোনকের খবর পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু কোনো খবর নেই। ইতিমধ্যে একটা ঝড় বয়ে গেছে, গালফ স্ট্রিম উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

কনোভারের এক বন্ধু উৎকণ্ঠিত হলেন। তিনি মিয়ামি কোস্টগার্ডকে খবর দিলেন। কোস্টগার্ডরাও চিন্তিত। তখন সার্চ পার্টি বেরিয়ে পড়ল। ইয়টখানি খোঁজবার জন্যে আকাশে কয়েক ঝাঁক বিমানও উড়ল। সমুদ্রপথেও বেশ কয়েকটা সার্চ পার্টি বেরিয়ে পড়ল এবং সমুদ্রে সম্ভাব্য সীমার মধ্যে প্রতি দ্বীপের প্রতিটি বন্দরে খোঁজ নেওয়া হলো কিন্তু রেভোনকের কোনো চিহ্ন নেই।

বিমানগুলিও বিস্তীর্ণ এলাকা খুঁজে দেখল। শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করতে লাগল কিন্তু কোথাও কোনো ইয়েটের চিহ্ন নেই অন্তত এক লক্ষ স্কোয়ার মাইলের মধ্যে কিছু পাওয়া গেল না।

একটা জিনিস পাওয়া গেল। মিয়ামি থেকে আশি মাইল উত্তরে রেভোনকের লাইফ-বোট ১২ ফুট লম্বা 'রেভোনক জুনিয়র'কে পাওয়া গেল। দেখে শুনে মনে হলো নৌকোটি স্থানচ্যুত করে ইয়ট থেকে নামানো হয়েছিল।

কিন্তু ইয়ট বা আরোহীদের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। 'সেফেস্ট অ্যাণ্ড ফাই-নেস্ট' ইয়ট এইভাবে হারিয়ে গেল। ব্যাপারটা অসম্ভব বলে মনে হলো। যে ঝড় উঠেছিল তা এমন প্রবল নয় যে রেভোনকের মতো ইয়ট ডুবে যেতে পারে কারণ এর চেয়েও বড় ঝড়ের মুখে এবং উত্তাল সমুদ্রে রেভোনক পড়েছিল এবং সে ঝড়ও সে কাটিয়ে বন্দরে ফিরে এসেছিল।

একেবারে বেমালুম লোপাট। কোনো চিহ্নই নেই? সমুদ্র তো এইভাবে সব কিছু গ্রাস করতে পারে না?

এই হলো বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্য। যারা গেছে তারা কোনো সূত্র বা চিহ্ন রেখে যায় নি। বেমালুম লোপাটই হয়ে গেছে।

রেভোনকের মর্মান্তিক ঘটনার প্রায় ছয় বছর পরে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। বার-মুডা ট্র্যাঙ্গেলের অনেক রহস্যের মধ্যে আরও একটি রহস্য।

সমুদ্রে কি ইয়ট রাক্ষসী আছে?

কাউণ্ট ক্রিস্টোফার ডি গ্র্যাবাউসকি নামে আমেরিকাবাসী একজন পোলিশ ভদ্রলোক 'মোটর বোটিং' পত্রিকার সম্পাদকের নিকট একটি চিঠি লিখে জানালেন যে ৫৯ ফুট দীর্ঘ একটি ইয়টে চেপে তিনি দীর্ঘ পাড়ি দেবেন। তিনি ছ মাস ধরে প্রায় ৮০০০ মাইল ভ্রমণ করবেন। ইয়টখানির নাম 'এনচ্যানট্রেস।' ইয়টখানি তাঁর নয়, তিনি তার ক্যাপটেন। ইয়টে সস্ত্রীক মালিক থাকবেন। মালিক দক্ষিণ ক্যালিফোরনিয়ার একজন ইনসিওরেন্স ব্যবসায়ী তবে ইয়ট ভ্রমণে তিনি নতুন।

পোলিশ ভদ্রলোক আরও লিখেছেন যে জানুয়ারী মাসের ৭ বা ৮ তারিখে (১৯৬৪)

সাউথ ক্যারোলিনার চার্লসটন থেকে এনচ্যানট্রেস নিয়ে তিনি যাত্রা করবেন।

গ্র্যাবাউসকি দুঃসাহসিক নাবিকরূপে ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ২৫ ফুট একটি নৌকোয় চেপে তিনি একটানা ট্যাঞ্জিয়ার থেকে আটলান্টিক পার হয়ে এবং বলা বাহুল্য বারমুডা ট্র্যাঙ্গল অতিক্রম করে নিউইয়র্ক পৌঁছেছিলেন। তাঁর নৌকা-টির নাম ছিল 'টেথিস'।

যে ইনসিওরেন্স ব্যবসায়ীর কথা গ্র্যাবাউসকি লিখেছেন তাঁর নাম জন এল পেলটন। ক্যালিফোরনিয়ার হুইটিয়ার শহরে তিনি বাস করেন এবং ইয়ট ভ্রমণে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

ধনী আমেরিকানদের ফ্যাশন হলো একখানা ইয়ট রাখা এবং সঙ্গী নিয়ে মাঝে মাঝে সমুদ্র ভ্রমণে যাওয়া। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে পেলটন নিউইয়র্ক সিটিতে এলেন এবং এনচ্যানট্রেস ইয়টখানি কিনলেন।

ইয়টখানি অবশ্য আনকোরা নতুন নয়। ১৯২৫ সালে একটি নামকরা কারখানায় তৈরি হয়েছিল কিন্তু অতি উত্তম অবস্থায় আছে। ইয়টখানি ৫৯ ফুট দীর্ঘ এবং টন হিসাব অনুসারে ২০ টন পর্যায়ে পড়ে।

ডেক এবং অন্যান্য বহু অংশ সেগুন ও মেহগনি কাঠের তৈরি। পালগুলি প্রায় নতুন আছে, এঞ্জিন অতিরিক্ত শক্তি সম্পন্ন তো বটেই এবং তা চালু অবস্থায় আছে। কোথাও কোনো ত্রুটি নেই।

এসব ছাড়া ইয়টখানিতে রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভার আছে, রেডিও মারফত ইয়ট থেকে টেলিফোনে কথা বলার ব্যবস্থা ছিল এবং রেডিও ডিরেকশন ফাইণ্ডার বসানো ছিল।

ইয়টখানিতে প্রচুর পরিমাণে লাইফ জ্যাকেট, লাইফ বেল্ট এবং ফাইবার গ্লাসের একটি আট ফুট লাইফবোট ছিল।

পেলটন খুব খুশি, তার অনেকদিনের ইচ্ছে এই রকম একটি সুন্দর ইয়টে চেপে অনেক দূর দূর সমুদ্র দূর সমুদ্রের নারিকেল ঘেরা অজানা ছোট ছোট দ্বীপ কিংবা সুবর্ণ বেলাভূমিগুলি দেখে আসে, দেখে আসে কত অজানা পাখির ঝাঁক। তার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

তবে এর আগে পেলটন কখনও কোনো ইয়টে চেপে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় নি, ইয়টের পালের শক্তি কতখানি বা কি তার ব্যবহার তাও তার জানা নেই। মোটর বোটে চেপে সে কাছাকাছি ঘুরে বেড়িয়েছে কিন্তু ইয়টের কোনো অভিজ্ঞতা তার ছিল না।

ইয়টের ব্যাপারটা নিজে শিখতে হবে। একজন ভালো ক্যাপটেন চাই যে ইয়টখানা

ভালো করে চালাতে পারবে আবার তাকে শেখাতেও পারবে। একজন সেই রকম লোক পাওয়া গেল। ম্যাসাচুসেটসে একটি বোটইয়ার্ডের সে ম্যানেজার, নাম ক্যাপ-টেন ফ্রাংক ডেভিস।

কিন্তু একটা মুশকিল আছে। বড়দিনের সময় ডেভিড ইয়টে থাকবে না। বড়দিনের ছুটিতে সে তার বাড়ি যাবে। বডদিনের সময় যদি ছুটি দাও তাহলে চাকরি নোব। পেলটন আপাতত রাজি হলো। সে আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। বড়দিন পর্যন্ত তো ঘুরে আসা যাক তারপর দেখা যাবে।

অতএব ১৮৬৪ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখে নতুন ক্যাপটেনের পরিচালনায় এন-চ্যানট্রেস সমুদ্রে ভেসে পড়ল। মেঘমুক্ত আকাশ, আবহাওয়া চমৎকার, হাওয়া অনুকূল। মাঝে মাঝে হাওয়ার গতি বেশ বেড়ে উঠেছিল কিন্তু তাতে অসুবিধে হয় নি, দক্ষ ক্যাপটেন অনায়াসে সামলে নিতে পারছিলেন।

চার্লসটন বন্দরে ইয়ট এসে ভিড়ল ১৩ ডিসেম্বর। ক্যাপটেন ফ্রাংক ডেভিস এখান থেকেই বাড়ি যাবেন। ভাগ্যক্রমে এই বন্দরেই আর একজন নতুন ক্যাপটেন পাওয়া গেল। তার অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং জনপ্রিয়। একা আটলান্টিক পার হলে সে জন-প্রিয় তো হবেই। এরই নাম কাউন্ট ক্রিস্টোফার ডি গ্র্যাবাউসকি।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে সমুদ্রে কাউন্ট পঞ্চাশ হাজার মাইল ঘুরে বেড়ি-য়েছে এবং একা। অতুলনীয় সাহস, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী এই ক্যাপটেন জোশুয়া স্লোকামের স্মরণে ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত 'স্লোকাম সোসাইটি'র ভাইস-কমোডোর।

১০ জানুয়ারি ১৯৬৭ তারিখে গ্র্যাবাউসকি যখন চার্লস্টন বন্দর থেকে এনচানট্রেসকে নিয়ে সেই রহস্যময় ত্রিকোণ বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের ভেতর দিয়ে যাত্রা শুরু করছিলেন তখন কি তিনি একবারও চিন্তা করেছিলেন যে বহুদিন পূর্বে তারই একজন পূর্বসূরী জোশুয়া স্লোকাম সমুদ্র যাত্রা থেকে আর ফিরে আসে নি, তিনিও তেমনি সমুদ্রের নীল রহস্যে বিলীন হয়ে যাবেন?

আর তাঁরই সঙ্গে উধাও হবে ইয়টের মালিক, তাঁর পত্নী এবং তাঁদের দুটি বালক পুত্র।

নীল সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে আকাশের বুক চিরে নীল গাংচিল ডানা মেলে যেমন উড়ে যায় ঠিক তেমনি সাদা পাল ফুলিয়ে সফেন ঢেউ কেটে এনচ্যানট্রেস ভেসে চলল। চলল ভারজিন আইল্যাণ্ডে সেণ্ট টমাসের দিকে।

যে গৌরব নিয়ে মোহিনী ইয়ট এনচ্যানট্রেস যাত্রা করেছিল সেই গৌরব নিয়ে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে তো পারেই নি, ফিরেও আসতে পারে নি। তিন দিন পরে

জ্যাকসনভিল বিচ স্টেশনের কোস্ট গার্ডরা একটা বিপদ সংকেত পেল। বিপদ সংকেত পাঠাচ্ছে এনচ্যানট্রেস। ফ্লোরিডা থেকে কিছুদূরে ইয়টখানা ঝড়ের মুখে পড়েছে।

কোস্ট গার্ডের লোকেরা বলল যে তারা এখনি যাচ্ছে কিন্তু ইতিমধ্যে এনচ্যানট্রেসের রেডিও অপারেটর যেন এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা গুনতে থাকে তাহলে কোস্ট-গার্ডরা এনচ্যানট্রেসের পজিশন ধরতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে এনচ্যানট্রেস থেকে এক-জন পুরুষ গুনতে আরম্ভ করল, ওয়ান, টু, থ্রি। কয়েক মিনিট পরে কণ্ঠস্বর বদলে গেল। এবার একজন বালক গুনতে আরম্ভ করল টেন, নাইন, এইট, সেভেন কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ক্রমশ দুর্বল হয়ে দুর্বলতর হতে হতে একেবারেই মিলিয়ে গেল। আর শোনা গেল না। কোস্ট গার্ডরা অনুমান করল চার্লস্টন থেকে ১৫৮ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে কোনো জায়গায় ইয়টখানা বিপদে পড়েছে। কোস্ট গার্ডদের সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ স্কোয়াড কয়েক মিনিটের মধ্যেই যাত্রা করেছিল। পরে নৌবহরের কয়েকটা জাহাজও অনুসন্ধানে যোগ দিয়েছিল। তারা বারো হাজার বর্গমাইল ঘুরেও এন-চ্যানট্রেসের কোনো পাত্তা করতে পারল না।

তাদের তো আসতে বিলম্ব হয় নি। কোথায় গেল সেই মোহিনী ইয়ট? এনচ্যান-ট্রেসের আরোহীদের মৃতদেহ বা কোনো ভাঙা অংশ, কিছুই পাওয়া যায় নি। বারমুডা ট্র্যাঙ্গল তাকে গিলে ফেলেছে? সেই পুরনো কাহিনী। বারমুডা ট্র্যাঙ্গল তার রহস্য উন্মোচন করবে না।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্যের তালিকায় আরও একটি নাম যুক্ত হলো।

তিন বছর পরে ১৯৬৭ সালে উপকূল থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে আর একটা ইয়ট উবে গেল। ইয়টখানার নাম 'উইচক্র্যাফট।'

ইয়টখানা এমনভাবে তৈরি যে সেটা ডুববে না, লাইফবয় ডোবে না, সেইরকম আর কি। ইয়টের ভেতরে ভেতরে এমন সব ফাঁপা বাক্স বসানো ছিল যেগুলি ইয়ট-খানিকে ভাসিয়ে রাখতে পারে। এ ছাড়া বিপদের সময়ে ব্যবহারের জন্যে ইয়টে অনেক লাইফ জ্যাকেট ছিল।

১৯৬৭ সালের বড়দিন এসে গেছে। সেদিন ২২ ডিসেম্বর। মিয়ামি বিচ শহরটা আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। অপূর্ব শোভা।

মিয়ামি বিচ হোটেলের মালিক ড্যান বুরাকের একটি ইয়ট আছে, সেই উইচক্র্যাফট। এনচানট্রেসের মতো অত বড় নয়, মাত্র ২৩ ফুট, তবে বেশ মজবুত।

সন্ধ্যার পর শহরের সব আলো জ্বলে উঠতেই বুরাক তার বন্ধু ফাদার প্যাট্রিক

হোর্গানকে বলল : চল হে ইয়ট ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়ি, আলোয় মোড়া মিয়ামি কেমন দেখাচ্ছে দূর থেকে দেখে আসি।

ফোর্ট লডারডেলের সেণ্ট জর্জস ক্যাথলিক চার্চের ফাদার এবং বুরাকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্যাট্রিক হোর্গান বলল : চল।

আপত্তির কি আছে ? হলোই বা রাত্তির। যতই বা ঝড় তুফান উঠুক এ নৌকো তো ডুববে না। ভেসে না হয় কিছু দূরে চলে যাবে তার বেশি তো আর কিছু হবে না। তাছাড়া ওরা তো আর বেশি দূরে যাচ্ছে না, বড়জোর মাইলখানেক।

ইয়টে ভেসে যেতে যেতেই ওরা দেখল শহরখানা সত্যিই রূপসীর সাজে সেজেছে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে।

রাত্রি ৯টার সময় মিয়ামির কোস্ট গার্ড অফিস একটা বিপদ সংকেত পেল। উইচ-ক্র্যাফট থেকে বুরাক বলছে তাদের ইয়ট জলের তলায় কিছুতে আটকে গেছে ফলে প্রোপেলারটা বেঁকে গেছে। হালের কোনো ক্ষতি হয় নি। ইয়টখানা বার করা যাচ্ছে না। এখনই কোনো বিপদ ঘটবে না তবে সাহায্য চাই। এঞ্জিন হয়তো চালানো যেতে পারে কিন্তু ইয়টখানা ভীষণ কাঁপবে।

কোস্ট গার্ডরা তিন মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল এবং উনিশ মিনিটের মাথায় অকু-স্থলে পৌছে কিছুই দেখতে পেল না। কোথায় সেই উইচক্র্যাফট ?

কোস্ট গার্ডরা তাদের অয়ারলেস মারফত বার্তা পাঠাল কিন্তু কোনো সাড়া নেই। কথা ছিল উইচক্র্যাফট বিপদসূচক আলো জ্বালিয়ে সংকেত করবে কিন্তু কোনো রকম আলো দেখা গেল না।

বেশ জোরে হাওয়া বইছে, সমুদ্রের ঢেউ বড হয়েছে কিন্তু তা বলে ঝড তুফান নয়। এমন বাতাসে বা ঢেউয়ে উইচক্র্যাফট ডুবে যাবার কথা নয়। কিন্তু কোথায় উইচ-ক্র্যাফট ? এ যেন সত্যি কোনো ডাইনির জাদু বিদ্যে! কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা যায় যে উপকূল বরাবর এবং সমুদ্রের বাইরের দিকেও ২৪,৫০০ বর্গ মাইল পর্যন্ত খোঁজ করা হয়েছে কিন্তু ইয়টখানি বা তার কোনো নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় নি।

পাঁচ দিন ধরে খোঁজ করা হলো কিন্তু উইচক্র্যাফট কোথায় হারিয়ে গেল। এনচ্যান-ট্রেস, উইচক্র্যাফট এদের কি কোনো অদৃশ্য হাত সমুদ্রের গভীরে এক আজানা দেশে টেনে নিয়ে গেল ?

মাঝে মাঝে দেখা যায় বারমুডা ট্রাঙ্গেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে পালছেঁড়া হালভাঙা জন-মানবহীন জাহাজ—এরা কি ভুতুড়ে জাহাজ? জাহাজ পরিত্যাগ করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়…

ভুতুড়ে জাহাজ

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের অনেক রহস্য। এই কাল্পনিক ত্রিকোণের সীমানায় যে অলৌকিক বা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছে তার কোনো কৈফিয়ত পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কেউ এক একটা জাহাজের রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন।

খবরের কাগজের পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে দু-একটা জাহাজের রহস্য খুঁজে বার করেছেন কিন্তু এ তো হলো অনেক বছর আগেকার কথা। হালফিল এমন সব ঘটনা ঘটছে যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মাঝে মাঝে ভুতুড়ে জাহাজ দেখা যাচ্ছে। জাহাজে একটাও লোক নেই, পানীয় জল ও আহার রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে অথচ জাহাজখানার চেহারা দেখলে ভয় পায়।

এলডারস অ্যাণ্ড ফাইফ কোম্পানির ব্রিটিশ জাহাজ 'এস এস অস্টেক' আটলান্টিক পার হয়ে ৯ সেপ্টম্বর ১৯৩৫ তারিখে ইংলণ্ডের ব্রিস্টল বন্দরে নোঙর ফেলল। জাহাজের ক্যাপটেন এবং চিফ অফিসার বললেন যে ১ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁরা একটা পরিত্যক্ত ছোটো জাহাজ দেখেছেন। জাহাটির নাম 'লা ডাহামা'। জাহাজে যদিও পানীয় জল ও খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে মজুত ছিল তথাপি জাহাজটি পরিত্যক্ত হওয়ার সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

তবে জাহাজখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হয়তো ঝড়ের মুখে পড়েছিল কিন্তু অবিলম্বে ডুবে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। অস্টেক জাহাজের নাবিকরা জাহাজখানিতে উঠে সব কিছু দেখে এসেছিল কিন্তু জাহাজ পরিত্যক্ত হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে ক্যাপটেনের লগবুকখানি নিয়ে চলে আসে।

২৩ আগস্ট তারিখ পর্যন্ত লগবুকে ক্যাপটেনের লেখা দেখা যাচ্ছে যথা, 'দক্ষিণ-পুবে বাতাস বইছে, এগিয়ে চলেছি, ব্রিটিশ স্টিমার খারল্যাণ্ড ক্যাসল অতিক্রম করলুম।' জাহাজের লাইফবোটগুলি যথাস্থানেই রক্ষিত ছিল। তাহলে অপর কোনো জাহাজ

অফিসার ও নাবিকদের উদ্ধার করছে। এই রকম অনুমান করা হলো।

অস্টেক জাহাজের ক্যাপটেন ও চিফ অফিসার ইংলণ্ডে যখন 'লা ডাহামা' জাহাজ সম্বন্ধে বিবৃতি দিচ্ছিলেন তখন 'রেকস্' নামে ইটালিয়ান জাহাজের ক্যাপটেন অ্যাল-বার্টো ওটিনো নিউইয়র্কে জানালেন যে ২৭ আগস্ট তারিখে আটলান্টিক সমুদ্রে তাঁরা 'লা ডাহামা' জাহাজখানি দেখতে পান।

সমুদ্র তখন শান্ত ছিল কিন্তু জাহাজ থেকে বিপদসূচক ডিস্ট্রেস সিগন্যাল উড়তে দেখে 'রেকস' জাহাজ তার সাহায্যে এগিয়ে যায় এবং অফিসার ও নাবিক মিলিয়ে পাঁচজনকে উদ্ধার করে।

উদ্ধার প্রাপ্তদের মধ্যে জাহাজের মালিক ফিলাডেলফিয়ার আলবার্ট জি ওয়েলস স্বয়ং ছিলেন। ওয়েলস বলেন যে জাহাজখানি ঝড়ের মুখে পড়ে রীতিমতো ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে। জাহাজে ক্রমাগত জল উঠছিল। তাঁরা পাঁচজন মিলে পালা করে সর্বদা পাম্প চালিয়ে যাচ্ছিল। 'রেকস্' এসে না পড়লে আর হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজে ডুবে যেত। তখন তাঁদের লাইফবোট চেপে ভেসে পড়তে হতো।

যাই হোক 'রেকস্' জাহাজের আঠারো জন নাবিক মিলে 'লা ডাহামা' জাহাজের লোকদের একটি মোটর-লাইফবোটের সাহায্যে উদ্ধার করে, তাদের ব্যক্তিগত সামগ্রী এবং জাহাজ চালাবার জন্যে দরকারি যন্ত্রপাতিও তুলে আনে।

পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে উদ্ধার কাজ সম্পূর্ণ হয়। রেকস্ জাহাজের ক্যাপটেন ওদের নিউইয়র্ক বন্দরে নামিয়ে দেন।

'লা ডাহামা জাহাজের পাঁচজন আহোরীকে উদ্ধার করার পর হঠাৎ জোর হাওয়া ওঠে। ক্ষতিগ্রস্ত 'লা ডাহামা' সেই ঝড়ের আঘাত সহ্য করতে না পেরে ডুবে যায়। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া 'রেকস্' জাহাজের যাত্রী ও নাবিকদের করার কিছু ছিল না।

তাহলে মজা হচ্ছে এই যে ২৭ আগস্ট তারিখে 'রেকস্' যে জাহাজকে সমুদ্রে ডুবে যেতে দেখল সেই জাহাজকেই ভাসমান অবস্থায় দেখলে 'অস্টেক' জাহাজের নাবিকেরা ১ সেপ্টেম্বর তারিখে! তাজ্জব!

একখানা জাহাজ কি ডুবে গিয়ে আবার ভেসে উঠতে পারে নাকি? লা ডাহামা জাহাজের ক্যাপটেনের কথা অবিশ্বাস করা যায় না কারণ তাঁর কাছে যে লগবুক-খানি রয়েছে!

তাহলে জাহাজখানা কি ভূতুড়ে? বৃদ্ধ নাবিকেরা বলে যে জাহাজ ডুবে গিয়েও নাকি ভেসে উঠতে পারে। বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলে বোধহয় এসবও সম্ভব।

লা ডাহামার বেশ কিছুকাল আগে হলেও 'ক্যারল এ ডিয়ারিং' জাহাজখানার ভৌতিক ব্যাপারও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। তখনও বেশ শীত আছে। একদিন সকালে নর্থ ক্যারোলিনার উপকূলের কেপ হ্যাটেরাস কোস্ট গার্ডরা অভূতপূর্ব এক দৃশ্য দেখে অবাক।

সমুদ্রের প্রায় তীর বরাবর 'ডায়মণ্ড শোলস' নামে কুখ্যাত ও বিপজ্জনক এলাকায় পাঁচ মাস্তুলের 'শুনার' জাতীয় একখানা জাহাজ ভাসছে। কোনো জাহাজ জেনে শুনে এখানে আসে না। সব জাহাজ এই এলাকাটা এড়িয়ে চলে কারণ এখানে একবার ঢুকে পড়লে বেরোন মুশকিল।

অথচ জাহাজখানা এখানে এলো কি করে? গতরাত্রে এমন কোন ঝড় হয় নি যাতে জাহাজখানা এখানে ভেসে আসতে পারে। অথচ তার পালগুলো বাতাসে ফুলছে। জাহাজের সামনের অংশ বোধহয় চোরাবালিতে আটকে গেছে।

এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার! ডায়মণ্ড শোলস্-এর ত্রিসিমানায় কোনো জাহাজ কখনও আসে না আর এই জাহাজখানা এখানে মরতে এলো কি করতে?

যাই হোক কোস্ট গার্ডদের কর্তব্য করতে হবে। জাহাজখানার অবস্থা দেখে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

সকালে যাদের ডিউটি ছিল তারা লগবুক খুলে দেখল যে গত রাত্রে সমুদ্র শান্ত ছিল, ঝড় ছিল না, বাতাসের গতি এবং অন্যান্য বিবরণী লেখা আছে। কোনো ডিস্ট্রেস সিগন্যালও আসে নি।

তবে আজ সকাল থেকে বেশ জোরে হাওয়া বইছে, সমুদ্র কিছু অশান্ত। প্রতি তরঙ্গের মাথায় সাদা ফেনার মুকুট।

জাহাজে নিশ্চয় লোক আছে, তাদের তো আগে উদ্ধার করতে হবে। কোস্ট গার্ডরা লাইফ বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিন্তু জাহাজের কাছে যেতে পারল না। সমুদ্র আরও অশান্ত হয়েছে। জাহাজের খুব কাছে যাওয়া মানে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা।

লাইফবোট যেখানে গিয়ে পৌঁছল সেখান থেকে জাহাজ চার'শ গজ দূরে। চোখে দূরবীন লাগিয়ে জাহাজের অবস্থা ভালোই দেখা যাবে।

জাহাজখানার নাম 'কেরল এ ডিয়ারিং।' দূরবীন দিয়ে যত দূর নজর করা গেল তাতে বেশ বোঝা গেল জাহাজে কোন লোক নেই। মুখে মেগাফোন লাগিয়ে ওরা চিৎকার করল কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

আরও ভালো করে নজর করতে লাগল। জাহাজের বাঁ দিকে একটা মই জলের

দিকে ঝুলছে। জাহাজে লাইফবোটগুলি নেই। আরোহীরা কি জাহাজ ছেড়ে লাইফবোট চেপে কোথাও চলে গেছে? কিন্তু কেন? এবং কখন? কোথায় গেল তারা?

দেখে তো মনে হচ্ছে জাহাজখানা সমুদ্র যাত্রার উপযোগী এবং ভাল অবস্থাতেই আছে। কয়েকদিন আবহাওয়াও তো ভালোই ছিল। দূর আটলান্টিকে একটা প্রবল ঝড় হয়ে গেছে কিন্তু সে তো এদিকে নয়।

কিছু করতে না পেরে ও কিছু বুঝতে না পেরে কোস্ট গার্ডদের লাইফবোট ফিরে এলো। মেবিন রেজিস্টার খুলে দেখল জাহাজের মালিক হলো মেন স্টেটের পোর্ট-ল্যাণ্ডের জি. জি. ডিয়ারিং কোম্পানি। মালিক অবশ্য দুজন। একজনের নাম জি. জি. ডিয়ারিং এবং তাঁর একজন অংশীদার আছে, তাব নাম ক্যাপটেন উইলিয়ম মেরিট।

জি. জি. ডিয়ারিং-এর ছেলের নামেই জাহাজের নামকরণ হয়েছে ক্যারল এ ডিয়ারিং।

২১১৪ টনের এই জাহাজের দাম দু লক্ষ ডলার। তৈরি হয়েছে ১৯২০ সালের আগে ঐ মেন স্টেটের বাথ বন্দরে।

কেপ হ্যাটেরাস কোস্টগার্ড ঘটনাটা তখন ডিয়ারিং কোম্পানিকে জানিয়ে দিলো। অবিলম্বে নর্থ ক্যাবোলিনার উইলমিংটন থেকে নৌকা বোঝাই সাহায্যকারী দল এবং কাছাকাছি অঞ্চল থেকে কোস্ট গার্ডরা এসে পড়ল। এখন সমুদ্র শান্ত হয়েছে। জাহাজের গায়ে নৌকো ভেড়ানো কঠিন হলো না। জাহাজখানি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। এমন কিছু বড় জাহাজ নয় যে অসুবিধা হবে। দুটি জীবিত প্রাণী পাওয়া গেল। মানুষ বা পাখি নয়, দুটি বেড়াল। এ ছাড়া জীবিত বা মৃত একটিও মানুষ জাহাজে নেই।

সব দেখে শুনে মনে হলো আরোহীরা সহসা জাহাজ ত্যাগ করেছে। টেবিলের খাবার সাজানো হয়েছিল কিন্তু কেউ আহার গ্রহণ করে নি বা সময় পায় নি। তারা যেন খেতে বসেছিল কিন্তু হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে পড়েছে। রান্নাঘরে পাত্রে কিছু খাবার ও রয়েছে, কোনো কোনো ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। কয়েকটা কেবিন দেখে মনে হলো অফিসাররা হয় তো খেতে গেছে, খাওয়া শেষ করে ফিরে এসে আবার কাজে বসবে। কিন্তু কোথায় কে! সবাই অদৃশ্য!

আর সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে জাহাজের কিছু কাগজপত্র, চার্ট এবং সামুদ্রিক যন্ত্র-পাতিগুলি।

এছাড়া গেছে অফিসার ও নাবিকদের লাগেজ, ক্যাপটেনের বড় ট্রংক, ক্যাম্বিশের

ব্যাগ। এগুলি ভারি জিনিস। হঠাৎ বা তাড়াতাড়ি জাহাজ ছাড়বার সময় এইসব ভারি জিনিসগুলি কি করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো ?

কেবিনে কয়েক জোড়া রবারের বুট পাওয়া গেল। এগুলি তো জাহাজের অফিসার বা নাবিকদের নয়। তাহলে কি জাহাজে অন্য লোক উঠেছিল ?

কেবিনের মধ্যে বাড়তি ঘরে একজন কেউ ঘুমিয়েছিল। তার চিহ্ন বর্তমান। বালিশ ও চাদর সাক্ষ্য দিচ্ছে।

একখানা নেভিগেশন চার্ট পাওয়া গেল। দেখা গেল জাহাজের পরিচালক ক্যাপটেন ওয়ার্মেল চার্টে কিছু কিছু লিখেছেন কিন্তু পরে দেখা গেল অন্য ব্যক্তির হস্তাক্ষর।

কি ব্যাপার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে আরোহীরা এত তাড়াতাড়ি জাহাজ ছেড়েছিল যে তারা খাবার সময়ও পায় নি।

জাহাজখানি সম্বন্ধে কোস্ট গার্ডরা নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল :—

পূর্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে ভারজিনিয়ার নিউপোর্ট নিউজ বন্দরে কয়লা বোঝাই করে 'ক্যারল এ ডিয়ারিং' দক্ষিণ আমেরিকার রিও ডি জেনিরো বন্দরের দিকে যাত্রা করে।

জাহাজের ক্যাপটেন ছিলেন জি. জি. ডিয়ারিং কোম্পানির অন্যতম অংশীদার স্বয়ং উইলিয়ম মেরিট। তাঁর ছেলে ছিল জাহাজের ফার্স্ট মেট।

জাহাজ ছাড়ার পর থেকেই জাহাজে কিছু কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। যাত্রা করার কয়েকদিন পরে জাহাজ যখন ডেলাওয়ার স্টেটের লিউয়েস বন্দরে থামল তখন ক্যাপটেন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাকে তখনই হাসপাতালে পাঠান দরকার। তাই করা হলো।

ক্যাপটেন উইলিয়ম মেরিট হাসপাতালে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেও অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাকেও হাসপাতালে পাঠান হলো।

ক্যাপটেন বিনা জাহাজ যেতে পারে না। লিউয়েস বন্দরে তাই জাহাজ আটকে রইল।

'ডিয়ারিং' জাহাজ থেকে পোর্টল্যাণ্ডের হেড অফিসে খবর পাঠান হলো, ক্যাপটেন ও ফার্স্ট মেট অসুস্থ, হাসপাতালে ; জাহাজ আটকে রয়েছে, ক্যাপটেন পাঠাও।

তাড়াতাড়ি কি ক্যাপটেন পাওয়া যায় না যাকে তাকে নিয়োগ করা যায়। তবুও একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ক্যাপটেন পাওয়া গেল। তাঁর নাম উইলিয়ম বি ওয়ার্মেল, বয়স ৩৬, বোস্টনে বাড়ি।

ওয়ার্মেল তাঁর সারা জীবনটাই সমুদ্রে সমুদ্রে কাটিয়েছে, চায়না সি-তে টাইফুন, উত্তর আটলান্টিকে হারিকেন, প্রবল সামুদ্রিক জোয়ার এসবের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে।

তিন বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু আবার যখন ডাক এলো থাকতে পারলেন না। তিনি নিজেই তাঁর মনের মতো একজন ফার্স্ট মেট বেছে নিলেন।

ওয়ার্মেলের একটা গুণ ছিল যে তিনি নাবিকদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে পারতেন। সব রকম জাহাজ চালাতে পারতেন এবং জাহাজের সব রকম কাজ জানতেন এবং নিজ হাতে সে কাজ করতে দ্বিধা করতেন না। নাবিকরা তাঁকে ঠকাতে পারত না। তাঁর এতরকম গুণের জন্যে সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

ডিয়ারিং জাহাজে নানা দেশের নাবিক ছিল, তারা সকলে ক্যাপটেন ওয়ার্মেলকে সাদরে গ্রহণ করল। বন্দরে জাহাজ অনেক দিন আটকে ছিল, নাবিকরা বেকার বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। ক্যাপটেন ওয়ার্মেল যত শীঘ্র সম্ভব জাহাজ ছেড়ে দিলেন।

রিও ডি জেনিরো বন্দরে পৌঁছে কয়লা খালাস করা হলো কিন্তু ফিরতি কোনো মাল বোঝাই করার অর্ডার না থাকায় ওয়ার্মেল খালি জাহাজ নিয়ে ওরা ডিসেম্বর তারিখে রিও বন্দর ত্যাগ করলেন।

পরবর্তী বন্দর ব্রিজটাউন, বারবেডস। বারবেডস পৌঁছে ওয়ার্মেল দেখলেন তাঁর জন্যে নির্দেশ অপেক্ষা করছে : জাহাজ নিয়ে ভারজিনায় নরফোক বন্দরে চলে এস।

ব্রিজটাউনে তাঁর কোম্পানির যে প্রতিনিধি ছিল তার কাছে ওয়ার্মেল বললেন : কিন্তু ব্রিজটাউন যে যাব এদিকে তো আমার শরীর খারাপ।

প্রতিনিধি বললেন : আপনার আবার শরীর খারাপ হয় নাকি ? এমন কথা তো শুনি নি। ও কিছু নয়, আপনি একটু সামলে নিয়ে জাহাজখানা নরফোকে পৌঁছে দিন।

অতএব ১৯২১ সালের ৯ই জানুয়ারি 'ডিয়ারিং' জাহাজ নিয়ে ক্যাপটেন ওয়ার্মেলকে ব্রিজটাউন ছাড়তে হলো। এবং এরপর আর কোনো বন্দরে ক্যারল এ ডিয়ারিং জাহাজ নোঙর ফেলে নি। নরফোক বন্দরেও সে কোনোদিন পৌঁছয় নি।

জাহাজকে আবাব দেখা গেল ২৩ জানুয়ারি। নর্থ ক্যারোলিনার উপকূল থেকে অদূরে রক্ষিত 'কেপ ফিয়ার' লাইটশিপ পার হযে গেল। কোস্ট গার্ডরা স্পষ্ট তাকে দেখেছিল। জাহাজ বেশ ভালোই চলছিল। কোস্ট গার্ডরা কোনো রকম ত্রুটি লক্ষ্য কবে নি। জাহাজ থেকেও কিছু জানানো হয় নি।

'ডিয়ারিং'কে আবার দেখা গেল ছ' দিন পরে। ডায়মণ্ডশোলস থেকে কিছু দূরে 'কেপ লুকআউট' লাইটশিপ অতিক্রম করল।

'কেপ ফিয়ার' লাইটশিপ থেকে 'কেপ লুকআউট' লাইটশিপের দূরত্ব আশি মাইল কিন্তু মাত্র আশি মাইল আসতে জাহাজখানার ছ'দিন সময় লাগল কেন ? এত বেশি সময় লাগা তো উচিত নয়।

এতদিন সে ছিল কোথায় ? কি করছিল ? উপকূল থেকে বেশি দূরে নয়। গভীর সমুদ্রে কোনো কারণে আটকে থাকার বা প্রবল ঝড়ে পড়ে বিপথগামী হবার কথা নয়। বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের আর এক রহস্য বোধহয়।

পরে যখন ডিয়ারিং নিয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছিল তখন 'কেপ লুক আউট' লাইট-শিপের ক্যাপটেন বলছিলেন যে শনিবার ২৯ জানুয়ারি তিনি একখানা 'শুনার' দেখতে পান। তিনি লক্ষ্য করেন যে জাহাজখানার কোয়ার্টার ডেকে, যেখানে নাকি অফিসারদের থাকবার কথা, সেখান থেকে একজন ব্যক্তি চিৎকার করে বলছে যে হালফিল ঝড়ে তার দুটো নোঙরই ছিঁড়ে গেছে। এই খবরটা যেন অন্যান্য জাহাজকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

যে লোকটি চিৎকার করছিল তার মাথার চুল লাল, কথার টানে বিদেশীভাব আছে এবং ক্যাপটেন ওয়ার্মেলের সঙ্গে তার চেহারার মিল ছিল না, তবে জাহাজখানা নিঃসন্দেহে 'ডিয়ারিং'।

এদিকে লাইট শিপের রেডিও বিকল হয়ে গিয়েছিল সেজন্যে অবিলম্বে সে কিছু জানাতে পারে নি। পরে একটা জাহাজ যেখানি তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তাকে ডিয়ারিং-এর বার্তা পাঠানো হয় কিন্তু সেই জাহাজ কোনো জবাব দেয় নি এবং জাহাজখানার নামও পড়া যায় নি!

তাহলে জাহাজখানার মতলব কি ছিল ? কোনো পাইরেট শিপ কি ? নাকি চোরাই মদ ছিল ? সেজন্যে পরিচয় গোপন রেখে সরে পড়ল ? সে সময়ে আমেরিকায় সুরা নিষিদ্ধ ছিল অতএব মদের চোরা চালানের ফলাও কারবার চলত।

কেউ কেউ পরে বলেছিল সেই অজ্ঞাত-পরিচয় জাহাজখানার নাম ছিল 'হিউইট'! কিন্তু ডিয়ারিং জাহাজের ক্যাপটেন ওয়ার্মেল তখন কোথায় ছিলেন ? বিপদ সংকেত তো তাঁরই জানাবার কথা। অথচ সেই লাল চুলওয়ালা যে বলল তাদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়েছিল কিন্তু গত ছ'দিনের মধ্যে সেখানে তো ঝড় হয় নি। আর 'হিউইট' নামে জাহাজেরও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

সুপরিচিত ইনসিওরেন্স প্রতিষ্ঠান লয়েডস-এর মতে হিউইট জাহাজই ডিয়ারিং জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের তুলে নিয়েছিল এবং পরে হিউইট নিজে বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

যাই হোক 'ক্যারল এ ডিয়ারিং' জাহাজ নিয়ে তোলপাড় আরম্ভ হয়ে গেল। বোর্ড অফ ইনকুয়ারি বসল। রহস্য সমাধানের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান আরম্ভ হলো। কোস্ট গার্ড এবং মার্কিন সরকারের ছ'টি বিভাগ জড়িত হয়ে পড়ল। বিভাগগুলো হলো নেভি, ট্রেজারি, স্টেট, নেভিগেশন, কমার্স এবং জাস্টিস।

একটা বোতল এসে নর্থ ক্যারোলিনা উপকূলে ঠেকল। বোতলের ভেতর থেকে একটি বার্তা বেরোল। তাতে লেখা ছিল :

একটি ট্যাংকার অথবা সাবমেরিন আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে। আমাদের নাবিক-দের বেঁধে রেখেছে। হেড কোয়ার্টারে এখনি খবর দাও। এই বার্তা কে লিখল? কোন্ হেডকোয়ার্টারে খবর দেওয়া হবে?

সেকালে এবং একালেও বার্তা সমন্বিত এমন বোতল সমুদ্রের ধারে কুড়িয়ে পাওয়া যায়।

বোতলখানা যিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাঁর নাম ক্রিস্টোফার কলম্বাস গ্রে। তিনি বললেন যে তাঁর মনে হয় নর্থ ক্যারোলিনা উপকূলের জেলে নৌকো থেকে এই বোতল ভাসানো হয়েছিল, ডিয়ারিং জাহাজ থেকে নয়।

বিস্তু ক্যাপটেনের স্ত্রী মিসেস ডব্লু বি ওয়ার্মেল (কেউ কেউ বলেন যে ক্যাপটেন ওয়ার্মেলের কন্যা লুলু) বোতলের ঐ বার্তার হস্তাক্ষর সনাক্ত করেন। তিনি বলেন যে এই হাতের লেখা হলো জাহাজের এঞ্জিনিয়ার হেনরি বেটসের। তিনজন হ্যাণ্ড রাইটিং এক্সপার্ট নাকি বেটসের হাতের লেখা যাচাই করে বেটসের অনুকূলে রায় দিয়েছে।

অতএব মিসেস ওয়ার্মেলের বিশ্বাস হয় যে জলদস্যু কিংবা বলশেভিকরা জাহাজ লুট করে সকলকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

জলদস্যুরা জাহাজ লুট করে থাকলে বন্দীদের হত্যা করে মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দিয়েছে এবং বলশেভিকরা জাহাজ লুট করে থাকলে বন্দীদের রাশিয়ায় চালান করে দিয়েছে। এতদিনে বন্দীরা ক্রীতদাসরূপে জমি চাষ করছে নয়তো কারখানায় কাজ করছে।

প্রশ্ন উঠলো জলদস্যুরা ডিয়ারিং জাহাজে উঠে কি লুট করবে? জাহাজ তো খালি ছিল। কোনো দামী মাল ছিল না। তাছাড়া মূল ভূখণ্ডের এত কাছে ডাকাতি অবাস্তব ব্যাপার।

বলশেভিকরা? নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট জানাল 'ইউনাইটেড রাশিয়ান ওয়ার্কারস অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাণ্ড ক্যানাডা' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এক বছর হলো জানা গেছে।

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য জাহাজের চাকরিতে ভর্তি হওয়া। সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ করা এবং জাহাজ দখল করে সোভিয়েট রাশিয়ার বন্দরে পালিয়ে যাওয়া।

গত এক বছরে কয়েকটা জাহাজে গোলমাল দেখা দিয়েছিল। 'উইলিয়ম ওব্রায়েন' নামে জাহাজে তো রীতিমতো গোলমাল হয়েছিল এবং কাছাকাছি একটি বন্দরে

জাহাজ ভেড়াতেও হয়েছিল। পরদিন জাহাজ বন্দর ছাড়ে কিন্তু তারপর আর ঐ জাহাজের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

ক্যাপ্টেন ওয়ার্মেলের কন্যা লুলু ওয়ার্মেল মনে করেন যে তাঁর বাবা এবং জাহাজের অন্যান্য সকলকে হত্যা করা হয়েছে। 'কেপলুক আউট' লাইটশিপের ক্যাপটেন, 'ডিয়ারিং' জাহাজের কোয়ার্টার ডেকে যাদের দেখেছিলেন তারাই হলো হত্যাকারী।

কিন্তু হত্যা করবে কেন? কারণটা কি? ওয়ার্মেল বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁকে হত্যার কারণ বা উদ্দেশ্য কি হতে পারে? জাহাজেও হত্যাকাণ্ডের কোনোই চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

আচ্ছা এমন কি হতে পারে? ডিয়ারিং জাহাজের সকলেই এমন এক অনারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল যে সকলে স্থির করল যে তাদের আত্মহত্যা করাই উচিত এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে আত্মহত্যা করে। জাহাজ ছাড়বার কয়েক দিনের মধ্যে জাহাজের ক্যাপটেন এবং ফার্স্ট মেট এবং জাহাজ ফেরবার পথে বারবেডসে জাহাজের ক্যাপটেন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এই দুটি তথ্য হলো আত্মহত্যা সমর্থকদের যুক্তি। কিন্তু তারও কোনো নিদর্শন নেই। সে ক্ষেত্রে জাহাজের লাইফবোট কোথায় যাবে? এবং আত্মহত্যার পর লাশগুলো কোথায় গেল? কেউ আত্মহত্যা করলে কোনো না কোনো সূত্র পাওয়া যায়।

'হিউইট' জাহাজের কথা আবার উঠলো। কারও কারও সুচিন্তিত অভিমত এই যে 'হিউইট' জাহাজই ডিয়ারিং জাহাজের আরোহীদের উদ্ধার করেছিল এবং পরে হিউইট নিজে কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে অথবা রহস্যময় বারমুডা ট্র্যাঙ্গল তাকে গ্রাস করে ফেলে।

টেকসাসের স্যাবিন বন্দরে হিউইট গন্ধক বোঝাই করেছিল তারপর ফ্লোরিডা ঘুরে সে উত্তরে পোর্টল্যাণ্ড বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। যাবার পথে বোধহয় ডিয়ারিং জাহাজের সঙ্গে দেখা হয় এবং আরোহীদের জাহাজে তুলে নেয়।

হিউইটকে আর পোর্টল্যাণ্ড পৌঁছতে হয় নি তার আগেই তাকে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল গ্রাস করেছিল। তবে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে নিউ জারসি তীরভূমি থেকে দূরে সমুদ্রে একটা অগ্নিকাণ্ড ও পরে রাশি রাশি ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। হিউইট জাহাজে তো গন্ধক বোঝাই ছিল অতএব বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে।

ভার্জিনিয়া শোলস এলাকায়, ডিয়ারিং জাহাজ আবিষ্কৃত হওয়ার কয়েকদিন পরে এই ঘটনা ঘটেছিল অতএব জাহাজখানা হিউইট হতে পারে। আশ্চর্য যে বিস্ফোরণ ও

অগ্নিকাণ্ডের ফলে জাহাজের কোনো ভগ্নাংশ সমুদ্রে ভাসতে দেখা যায় নি। একটা মৃতদেহও নয়।

'ক্যারল এ ডিয়ারিং' পরিত্যক্ত অবস্থায় ভূতুড়ে জাহাজের মতো অনেক দিন সমুদ্রে পড়েছিল। জাহাজখানা নষ্টই হয়ে গিয়েছিল, তাকে আবার ব্যবহার করার কোনো উপায়ই ছিল না।

কোস্ট গার্ড স্থির করল জাহাজখানা তারা ভেঙেই ফেলবে কিন্তু প্রবল ঝড় তাদের পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলো। ঝড়ের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। টুকরো টুকরো হয়ে সে ভেঙে পড়ল।

কেপ হ্যাটেরাসের অনেক দোকানে ডিয়ারিং জাহাজের কিছু কিছু চিহ্ন সযত্নে রাখা আছে। ট্যুরিস্টদের দেখান হয়।

জাহাজের ঘণ্টা ও আলো স্বয়ং ক্যারল এ ডিয়ারিং-এর বাড়িতে রক্ষিত আছে। ক্যারল বর্তমানে মেন স্টেটের বাথ শহরে বাস করছে।

কিন্তু রহস্য আজও রহস্যই রয়ে গেল!

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্যজালে আটকে আছে আরও ভূতুড়ে জাহাজ। এরা কোথা থেকে এলো, কেন এলো তাও যেমন জানা যায় না তারপর একদিন কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় তাও জানা যায় না।

অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণ অনেক সময় জানা যায় তখন তারা প্রবল ঝড়ে পড়ে অন্য কোথায় ছিটকে চলে যায় বা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

'টিগেনমাথ ইলেকট্রন' ইয়টখানার কথাই ধরা যাক। ইয়টখানার মালিকের নাম ডোনাল্ড, কাউহার্স্ট। তিনি নিজে একজন পৃথিবী বিখ্যাত ইয়টসম্যান, খুব ভালো ইয়ট চালাতে পারেন।

বিলেতের সানডে টাইমস পত্রিকা একটা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। ইয়টে চেপে সবচেয়ে কম সময়ে যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। এই প্রতিযোগিতার নাম দেওয়া হলো গোল্ডেন গ্লোব রেস।

কাউহার্স্ট যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন তাতে মনে হয়েছিল যে তিনিই প্রথম হবেন কিন্তু ১১ জুলাই ১৯৬৯ তারিখে লণ্ডন টাইমস খবর দিলো যে ইয়টখানা দেখা গেলেও কাউহার্স্ট তার ইয়ট থেকে অদৃশ্য।

ইয়টের লগবুক থেকে জানা যায় যে ১লা জুলাই পর্যন্ত তিনি ইয়টে ছিলেন কিন্তু তারপর তিনি অদৃশ্য। একজন পৃথিবী বিখ্যাত লোক কি করে অদৃশ্য হয় কে জানে।

অদৃশ্য হওয়ার কারণ অনেকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন। ইংলণ্ড ছেড়ে কাউহার্স্ট আটলান্টিক সমুদ্রে বেশ খানিকটা গিয়েছিলেন তারপর তিনি দুই আমেরিকার মাঝে সমুদ্রে ঘোরাফেরা করতে থাকেন এবং তাঁর শক্তিশালী রেডিও ট্রান্স মটার মারফত পৃথিবীর নানা বন্দরের নাম উল্লেখ করে মিথ্যা রিপোর্ট পাঠাতে থাকেন।

নিয়ম ভঙ্গ করে দু'বার নাকি জমিতেও কিছুকাল ছিলেন। তাঁর এই ফাঁকি নাকি প্রথম সন্দেহ করেছিলেন প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক স্যার ফ্রান্সি চিকস্টার যিনি একা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

কিন্তু দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং নামী একজন ব্যক্তি এই ভাবে ফাঁকি বা ধাপ্পা দেবেন কেন? তাই যদি হয় তাহলে কি পরে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আত্মহত্যা করলেন? আর তাঁর পরিত্যক্ত খালি ইয়টখানা অবলম্বনহীন হয়ে বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের জলে ভূতের মতো ভাসতে লাগল?

তারপর ধরুন ব্রিটিশ তরী 'ম্যাপলব্যাংক', ৩৫ ফুট দীর্ঘ ইয়ট 'কটোপ্যাকসি', আরও একখানা ইয়ট 'ভ্যাগাবণ্ড', ব্রিটিশ ট্যাংকার 'হেলি দোমা'। এরাও ভূতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল অবশ্য জানি না ভূতের দল এইভাবে ঘুরে বেড়ায় কিনা কিন্তু কাণ্ডটা ভৌতিক। এইসব সামুদ্রিক যানে একটিও মানুষ পাওয়া যায় নি। তারা কোথায় গেল তাও কেউ জানে না।

৭

কোস্ট গার্ডের অনুসন্ধান ও উদ্ধার শাখার একজন মুখপাত্র একদিন বললেন: এই তথাকথিত বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের ভিতর যে কি ঘটছে সত্যি কথা বলতে কি আমরা তার কিছুই জানি না। আমরা শুধু অনুমান করতে পারি।

আকাশেতেও ফাঁদ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে যেটুকু বাকি তারপরই যেন বারমুডা ট্র্যাঙ্গল ক্ষেপে উঠলো। শুধু জলে নয় আকাশেও এমন সব কাণ্ড ঘটতে লাগল যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। একেবারে মানুষের কল্পনার বাইরে।

এই বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যেখানে নানারকম কম নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে সেখানেও সেই যুগে মানুষের সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ করে মানুষকে বোকা বানিয়ে দিচ্ছে এই বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের ওপরের আকাশ! আজকাল জাহাজ বা

বিমানের সঙ্গে বেতার মারফত ডাঙার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা নতুন কিছু নয়। ব্যবস্থা অনেক দিন ধরেই চলে আসছে কিন্তু হায় সে ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জাহাজ বা বিমান কোনো খবর না দিয়েই কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

বেতারে তারা খবর দিতে পারে না তা নয়, যন্ত্রগুলোই বেমালুম বিকল হয়ে যায়। শুধু একখানা বিমান হলেও না হয় কথা ছিল কিন্তু একসঙ্গে যদি পাঁচখানা বিমান থাকে তাহলে পাঁচখানারই বেতারযন্ত্র বিকল হয়ে যাচ্ছে।

তাদের খোঁজে যে বিমান পাঠানো হলো তারও ঐ একই অবস্থা। বেতার মারফত সে তো কোনো খবর পাঠাতে পারলই না, সেও অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটাকে বলা হয় "গ্রেটেস্ট অ্যাভিয়েশন মিস্ট্রি অফ অল টাইম"।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বে ফ্লোরিডা স্টেটের একটি নেভাল বেসে এই রহস্যের সূত্রপাত। সেদিন প্রকৃতি ছিল শান্ত, রুটিন কাজে কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না। শেষ মুহূর্তে রুটিনের কোনো আকস্মিক পরিবর্তনও হয় নি অথচ অভাবনীয় যে ঘটনাটা ঘটল বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

১৯৪৫ সালের কোনো একদিন। ফ্লোরিডার আবহাওয়া তখন বেশ আরামপ্রদ। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে জ্যাক্সনভিল। এখানে রয়েছে নেভাল এরোনটিকের বিমান ক্ষেত্র যার নাম সেসিল ফিল্ড।

এই বিমানক্ষেত্রে সেদিন কর্মীরা যখন কাজে এলো তখন এমন কিছু তাদের নজরে পড়ল না যা নিয়ে তারা কিছু মন্তব্য করতে পারে। অন্য দিনের মতো এ দিনটিও পরিষ্কার।

যে যার কাজে মনোনিবেশ করল। 'ওভারওয়াটার নেভিগেশানাল ফ্লাইট নামে একটা রুটিন কাজ আছে। প্রতিদিন বিকেলে কিছু বিমান সমুদ্রের ওপর মহড়া দেয়।

সেসিল ফিল্ড বৈমানিকদের ডাইভ বম্বিং-এ ট্রেনিং দেবার কেন্দ্র। যারা মহড়া দেবার তারা কেউ নতুন বা আনাড়ি নয়। তারা সকলেই যোগ্য পাইলট তবে বোমা নিক্ষেপে তাদের নতুন ধরনের কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হবে সেই জন্যই এই মহড়া।

নতুন নতুন বিমান আবিষ্কৃত হচ্ছে। আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন বোমা, পরিবর্তন হচ্ছে যুদ্ধের কৌশল অতএব নতুন বিষয়ে শিক্ষা নিতে হয়।

এই মহড়ায় যে বিমান ব্যবহৃত হতো তার নাম ছিল 'ডন্টলেস'। এই ডন্টলেস বিমানের কিছু পরিবর্তন করে যে বিমান তৈরি হলো তার নাম হেল ডাইভার। এগুলি বোমারু বিমান।

সেসিল ফিল্ডে এই বিমান ছিল ২৫০ খানা। প্রতিদিন দু' ঘণ্টা ধরে ১০০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে বারোখানা বিমানের একটা স্কোয়াড্রন মহড়া দিত।

স্কোয়াড্রনের দশখানা বিমানে থাকত শিক্ষার্থীরা আর বাকি দু'খানাতে শিক্ষক অর্থাৎ ইনস্ট্রাক্টর। প্রতি বিমানে থাকত দুজন, তাদের একজন পাইলট আর একজন বম্বার-রেডিওম্যান।

এই ওভারফ্লাইটগুলিতে প্লেনগুলি আকাশে উঠে নিজ নিজ নির্ধারিত পথে উড়ে আবার বিমানক্ষেত্রে ফিরে আসত।

বিপদ জীবনরক্ষার জন্যে বৈমানিকদের 'মে ওয়েস্ট' নামে একরকম আবরণী পরতে হয়। এটি গলায় ঝোলানো থাকত। তাছাড়া প্রতি প্লেনে রবারের বোট থাকত। বোটে থাকত আপৎকালীন খাদ্য ও ঔষধপত্র।

বলা বাহুল্য বিমানগুলি আকাশে ওঠবার আগে তাদের এঞ্জিন ও যন্ত্রগুলি উত্তম-রূপে পরীক্ষা করা হতো, দেখে নেওয়া হতো সমস্ত সরঞ্জাম যথাযথভাবে রক্ষিত আছে কিনা।

বিমান আকাশে ওঠার পর নিচে বিমানক্ষেত্রে বিমানগুলি ফেরার সময় পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকত সকলে। তবে কণ্ট্রোল টাওয়ারে রেডিওম্যান কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে সতর্ক থাকত।

একদিন বারোখানা বিমান যথারীতি আকাশে উঠলো কিন্তু নির্ধারিত সময়ে দশখানা বিমান ফিরে এলো। দু'খানা বিমান আর ফিরে এলো না।

যারা ফিরে এসেছিল তারা বলল অবহাওয়া চমৎকার ছিল এবং তারা কোনো অসুবিধায় পড়ে নি। আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। বহুদূর পর্যন্ত দেখার কোনো অসুবিধে হয় নি।

ঐ দু'খানা বিমান কণ্ট্রোল টাওয়ারে বা অন্য বিমানকে কোনো বিপদ সংকেত পাঠায় নি, যান্ত্রিক কিছু গোলযোগের জন্যও কোনো অভিযোগ করে নি।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধানী বিমান পাঠান হলো। নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়িয়ে তারা দূর পর্যন্ত দেখে এলো। সমুদ্রের জাহাজগুলিকেও সতর্ক করা হলো কিন্তু বিমান দু'খানির কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। তারা যেন উবে গেছে। কোনো দুর্ঘটনার খবরও পাওয়া গেল না।

সকলেই বিস্মিত, বিমূঢ়। পরে আর এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। কাজকর্ম যথা-রীতি চলতে লাগল। অদৃশ্য বিমান দু'খানি নিয়ে আলোচনা ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে হতে একদিন থেমে গেল।

এবার আসল কাহিনী যার নাম 'গ্রেটেস্ট অ্যাভিয়েশন মিস্ট্রি' বা 'লস্ট পেট্রল

মিট্রি।

ঐ বছরেরই ৫ ডিসেম্বর। ফ্লোরিডারই একটি বিমানক্ষেত্র নাম ফোর্ট লডারডেল এয়ার স্টেশন। এখানেও পাইলটদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

এখানকার পাইলটরা শিক্ষার্থী হলেও কেউ অযোগ্য বা অনভিজ্ঞ নয়। প্রত্যেকে অন্তত ৩৫০ থেকে ৪০০ ঘণ্টা পর্যন্ত আকাশে উড়েছে, নিজেরা বিমান চালিয়েছে। এরা ডণ্টলেস বা হেল ডাইভার বিমান চালায় না। এরা চালায় টি বি এম অ্যাভেঞ্জার টরপেডো বম্বার এবং এই বিমান প্রত্যেক পাইলট অন্তত ৫৫ ঘণ্টা আকাশে উড়িয়েছে। অতএব এই পাইলটদের দলে আনাড়ী কেউ ছিল না। সকলে নিজের নিজের কাজ উত্তমরূপে জানত।

গঠন নৈপুণ্যে, কার্য সম্পাদনে এবং অভিষ্টলাভে তখনও পর্যন্ত যত বোমারু বিমান তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে অ্যাভেঞ্জার ছিল অদ্বিতীয়। এর ডানার বিস্তার ছিল ৫২ ফুট। কম নয়। এঞ্জিনের শক্তি ছিল ১৬০০ হর্স পাওয়ার। তাই বা কম কি? গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৩০০ মাইল এবং ২০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত টর্পেডো বোমা বহন করতে পারত।

টর্পেডো বোমার বিশেষত্ব ছিল যে এগুলি জলে পড়ে টর্পেডোর মতো ছুটে গিয়ে জাহাজকে আঘাত করত। জাহাজের বিশেষ ভীতির কারণ ছিল এই অ্যাভেঞ্জার বিমান।

প্রতি প্লেনে থাকত তিনজন করে বৈমানিক, একজন পাইলট, একজন রেডিওম্যান এবং একজন গানার।

সেদিন ডিসেম্বরের ৫ তারিখে বুধবার বিকেলে যে মহড়া হবে তাতে ফ্লাইট লিডারের বিমানে মাত্র দু'জন থাকবে কিন্তু বাকি চারখানা বিমানে তিনজন করেই বৈমানিক থাকবে। অর্থাৎ মোট ১৪ জন।

সে'দনকার মহড়া 'ফ্লাইট নাইনটিন' নামে চিহ্নিত এবং পাঁচখানি বিমান নিয়ে স্কোয়াড্রন গঠিত।

এই ১৪ জনই অভিজ্ঞ বৈমানিক, ১৩ মাস থেকে ৬ বছর পর্যন্ত তাদের আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা ছিল। এ ছাড়া তাদের আর সব রকম দক্ষতা তো ছিলই।

সেদিনের মহড়ার প্ল্যান তারা উত্তমরূপে বুঝে নিয়েছিল। তারা আকাশে উঠে প্রথমে যাবে পুব দিকে ১৬০ মাইল, তারপর উত্তরে ৪০ মাইল তারপর বিমানের নাক ঘুরিয়ে দক্ষিণ-পুব দিকে বেঁকে একটি ত্রিকোণ রচনা করে এয়ারবেসের দিকে আসবে।

বোঝবার কোনো অসুবিধে নেই। এসব তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জল-

তাই বললেই চলে।

কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। বিকেলের মহড়া না বাতিল হয়ে যায়! তাহলে তো ভালোই হবে। ওরা বাড়িতে চিঠি লেখবার সময় পাবে। সামনেই তো বড়দিন। বাড়ি যাওয়ার ছুটি মিলবে।

তাছাড়া সেদিন সন্ধ্যায় এয়ার বেস থিয়েটারে নতুন নাটক খোলা হবে, 'হোয়াট নেক্সট' করপোরল হারগ্রেভ'? ডিউটিতে যেতে না হলে নাটকটা মজাসে দেখা যাবে।

কিন্তু বিকেলের আগে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। রোদ উঠলো, হাওয়ার গতি সাধারণ অপেক্ষা একটু জোর। এমন কিছু নয়।

সেদিন যে চৌদ্দজনের ডিউটি ছিল তাদের মধ্যে তিনজন ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ত্রিমূর্তি। শয়ন গমন হাসি ক্রন্দন সব একসঙ্গে। এই তিনজন হলো সার্জেন্ট রবার্ট গ্যালিভান, প্রাইভেট ফার্স্ট ক্লাস রবার্ট গ্রুবেল এবং করপোরাল অ্যালেন কসনার। এরা তিন-জন একই ব্যারাকে থাকত।

বিমান ওঠাবার আগে ওদের অপারেশন বিল্ডিং-এ গিয়ে আর একবার নির্দেশ নিতে হতো তাছাড়া বোধহয় খাতাপত্তর সই করতে হতো, চাবি-টাবি নিতে হতো, রুটিনে কোনো পরিবর্তন হলে তা জেনে নিতে হতো।

সেদিনও ওরা একই ঘরে নিজের নিজের বাংকে শুয়ে বই পড়তে পড়তে গল্পগুজব করছিল। ঘণ্টাখানেক বাকি থাকতে গ্যালিভান আর গ্রুবেল উঠে পড়ল। আড়-মোড়া ভেঙে দেহের কল-কব্জাগুলো সচল করে নিয়ে ইউনিফর্ম পরতে লাগল।

কসনার তার ব্যাংক থেকে উঠলো না। হাই তুলে টান টান হয়ে শুয়ে রইল তারপর উঠে বন্ধুদের সাজগোজ দেখতে লাগল।

এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করল: কি রে যাবি না? নে উঠে ফ্লাইট জ্যাকেট পরে নে।

--নারে, আমার ভালো লাগছে না, আমি আজ আর নাই বা গেলুম···

—যাবি না কি রে?

—না, ভলো লাগছে না, তাছাড়া শোন্ এ মাসে আমার ফ্লাইট টাইম পুরো করে দিয়েছি, আমি না গেলে জোর করতে পারে না, তোরা যা আমার আজ মেজাজ নেই, গেলে হয়তো একটা অ্যাকসিডেন্ট করে বসব, তার চেয়ে···

দুই বন্ধু আর কিছু বলল না। তারা ততক্ষণে রেডি। সময়ও হয়ে এসেছে। ঠিক আছে। ওরা জানিয়ে দেবে। যাবার আগে ওরা দুজনেই কসনারকে বলল:

—সো লং—

—সি ইয়া, গুড বাই, ফিরে আয় কথা আছে, এই বলে কসনার তার বাংকে আবার

শুয়ে পড়ল। বন্ধুরা যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

আর তাদের সঙ্গে কসনারের দেখা হয় নি। সেই শেষ বিদায়।

গ্যালিভান আর গ্রুবেল দুজনেই গানার। ওরা তাড়াতাড়ি অপারেশন বিল্ডিং-এর দিকে চলতে লাগল। ডিউটিটা শেষ করতে পারলে বাঁচে। কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে কি হবে? আগে গেলেই আগে প্লেন ছাড়তে পারবে না। সবই তো নিয়মে বাঁধা, ঘড়ি ধরে কাজ করতে হবে।

সেদিন গ্রুবেলের উৎসাহ যেন একটু বেশি। সেটা ঠিক। সেদিন বলে নয়। গ্রুবেল আকাশে উড়তে ভালোবাসে। আকাশে উঠলে তার মনে কিসের জোয়ার আসে।

গ্যালিভান ঠাট্টা করে বলল: কি রে 'ইয়ো ইয়ো', খুব উড়তে শিখেছিস? না?

বন্ধুরা সবাই গ্রুবেলকে 'ইয়ো 'ইয়ো', বলে ডাকে। ছেলেরা হাতে একরকম কাঠের বা প্লাস্টিকের চাকার ভেতর সুতো বেঁধে ছুঁয়ে দেয়, আবার গুটিয়ে নেয়। সেই-গুলোকে বলে ইয়ো ইয়ো। আমাদের ছেলেমেয়েরা বলে হাত লাট্টু।

বন্ধুর মন্তব্য শুনে গ্রুবেল শুধু হাসল। সে সত্যিই আকাশে উঠতে ভালোবাসে। আকাশে উঠে সে মনে করে সে যেন স্বর্গের কাছে পৌঁছে গেছে কারণ মনে মনে সে একটু ধর্মপ্রবণ। তার ইচ্ছে এখানকার ট্রেনিং শেষ হলে সে বিমানবহরের চাকরি নেবে না। ডিভিনিটি স্কুলে ভর্তি হয়ে পাদ্রি হবে।

গ্যালিভান তার ডিউটি করতে ভালোবাসে, সে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করে না। তার তিন চার বছর চাকরি হয়ে গেল। যুদ্ধের সময় সে প্যাসিফিক কমাণ্ডে ছিল। সে তখন ভাবছে কসনারটা এলো না কেন? ওরা তো সব সময়ে তিনজনে একই সঙ্গে ডিউটিতে যায়। আজ এরকম হলো কেন? থাকগে, এই তো কয়েকটা ঘণ্টা। তারপর বিকেল চারটেয় ফিরে এসে তিনজনে আবার জমানো যাবে। আজকের নাটকটা নাকি হাসির! অপারেশন সেন্টারে এসে ওরা দেখল বাকি সকলে এসে গেছে। কসনার অনুপস্থিত। তার জায়গায় লোক দেওয়া হলো। লোক বোধহয় রিজার্ভ থাকে। শেষ মুহূর্তে কেউ তো অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।

যাইহোক ফ্লাইট নাম্বার নাইনটিনের দল তখন রেডি। তার নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হলো। অক্ষর মতো সেই নির্দেশ, একটুও এদিক ওদিক নড়চড় হবার উপায় নেই।

বিমানের এঞ্জিন, অন্যান্য যন্ত্র, ফুয়েল, রেডিও পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। সব ঠিক আছে, জাহাজ হাজার মাইল ওড়ার মতো ট্যাংকে ফুয়েল আছে।

বেলা ঠিক ১টা ৩০ মিনিটে ওরা নিজ নিজ বিমানের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক দুটোয়, প্রথম বিমান টেক অফ করল। তারপর বাকি চারখানা লঙার-

ডেল এয়ার স্টেশনের রানওয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে আকাশে উঠলো। একটু পরেই পাঁচখানা অ্যাভেঞ্জারকে আকাশে দেখা গেল। পুব দিকে ওরা আটলান্টিক সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। একটা ভাঙা জাহাজ আছে। জাহাজখানা তাদের লক্ষ্য। মহড়াস্বরূপ ছো মেরে নিচে নেমে ভাঙা জাহাজের দিকে ওরা টর্পেডো বোমা ছুঁড়ে আবার আকাশে উঠলো। এইরকম কয়েকবারই করবার পর ফ্লাইট নাইনটিনের পাঁচখানা বিমান আবার আকাশে উঠে নিজেদের সাজিয়ে নিলো। এবার ওরা কাল্পনিক ত্রিকোণ রচনা করে লডারডেল এয়ারবেসে আসবে।

সেদিন সেই অভিশপ্ত বিমান পেট্রল সম্বন্ধে এই হলো শেষ জ্ঞাত তথ্য। এদিকে নিচে ব্যারাকে বসে অ্যালেন কসনার তার বাড়িতে উইসকনসিন স্টেটের কেনোসা শহরের ঠিকানায় চিঠি লিখছে। চিঠি লেখা শেষ করে খামে ভরে ঠিকানা লিখে খাম বন্ধ করে হাতে ঘড়ি দেখল ৩-১৫। আর তো পনেরো মিনিট পরে গ্যালিভান আর গ্রুবেল ফিরে আসবে। আর ঠিক এই সময়েই লডারডেল কণ্ট্রোল টাওয়ারে যে রেডিওম্যান ডিউটিতে ছিল সে তখন ঘড়ি দেখছে। সামনেই বড গোল ঘড়ি। টক টক করে চলছে, সেকেণ্ড পর্যন্ত সময় নির্দেশ ক'রে আর একটা সরু কাঁটা এগিয়ে চলেছে।

আর পনেরো মিনিট বাকি আছে। চারটে বাজলেই তার ছুটি, অন্য লোক আসবে। শেষবারের মতো সে লগবুকখানা চেক করতে লাগল। বেশ নিশ্চিন্ত মনে সে কাজ করছে।

আর ঠিক সেই সময়ে রেডিওতে অনিশ্চিত ও ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ভেসে এলো: 'কণ্ট্রোল টাওয়ার দিস ইজ অ্যান এমারজেন্সি, আমাদের খুব বিপদ, মনে হচ্ছে আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, আমরা মাটি দেখতে পাচ্ছি না আবার বলছি ··আমরা মাটি দেখতে পাচ্ছি না, উই ক্যাননট সি ল্যাণ্ড।'

কথাগুলো বললেন ১৯ নং ফ্লাইটের কমাণ্ডাণ্ট ছ'বছরের অভিজ্ঞ লেফটেনাণ্ট চার্লস টেলর।

কণ্ট্রোল টাওয়ার থেকে উদ্বিগ্ন রেডিওম্যান প্রত্যুত্তরে বলল:

'তোমরা ঠিক কোথায় আছ? হোয়াট ইজ ইওর পজিসন?'

'তাতো বলতে পারছি না,' টেলর উত্তর দিলো 'আমরা হারিয়ে গেছি মনে হচ্ছে।'

কণ্ট্রোল টাওয়ারের অপারেটররা মুখোমুখি চাইতে লাগল। এ কি করে হয়? আকাশে মেঘ নেই, কুয়াশা নেই, ঝড় নেই, ওড়বার পক্ষে আদর্শ আবহাওয়া, সবকটা মেশিন ভালো, পাইলটরা অভিজ্ঞ, কি করে তারা পথ ভুল করতে পারে?

কণ্ট্রোল টাওয়ার বলল: 'পশ্চিম দিকে প্লেনের মুখ ঘোরাও।' এই নির্দেশের জবাব

শুনে কণ্ট্রোল টাওয়ার স্তম্ভিত।

'পশ্চিম কোন্ দিকে আমরা ঠিক করতে পারছি না···সব গোলমাল হয়ে গেছে··· আশ্চর্য·· কোনো দিকই আমরা ঠিক করতে পারছি না···সূর্যও দেখা যাচ্ছে না এমন কি নিচে ওটা সমুদ্র কি না তাও আমরা বুঝতে পারছি না···টাওয়ারের সবাই রীতিমতো অবাক। পাইলট বলে কি ?

টেলরের প্লেনের কম্পাস না হয় খারাপ হয়েছে কিন্তু আর তো চারটে প্লেন আছে ? তাদেরও কি কম্পাস বিকল হয়ে গেল নাকি ? পশ্চিম কোন্ দিকে তা কেউ চোখে দেখেও ধরতে পারছে না ? এয়ারপোর্ট থেকে বেশি দূরেও তো যায় নি ? সূর্য এখন ডোববার মুখে হলেও অদৃশ্য হয়ে যায় নি তো ? তবে ?

এরপর টাওয়ার শুনতে পেল পাঁচখানা প্লেন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। ওরা পরস্পরের প্লেন দেখতে পাচ্ছে কিন্তু সকলেই দিগ্‌ভ্রান্ত। তাদের কথাবার্তা শুনে টাওয়ারের অপারেটরা বেশ বুঝতে পারল যে পাইলটরা ভয় পেয়েছে।

লেফটেনাণ্ট টেলর নার্ভাস হয়ে পড়েছে। সে আর কমাণ্ড রাখতে পারল না। তার মাথা ঘুরছে। তখন চারটে বেজে গেছে। টেলর কমাণ্ড ছেড়ে দিলো। মেরিন ক্যাপটেন জর্জ স্টিভার্স ভার নিলো।

এই দুঃসংবাদ নিচে এয়ারবেসে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সবলেই উদ্বিগ্ন। অ্যালেন কসনার চিঠি ফেলে রেখে রেডিও টাওয়ারে ছুটে গেল। তখন চারটে বেজে পঁচিশ মিনিট।

জর্জ স্টিভার্স কথা বলছে। রেডিও বোধহয় বিকল হয়ে যাচ্ছে। শব্দ বা ধ্বনিবিস্তার খুব স্পষ্ট নয় তবুও বোঝা যাচ্ছে। স্টিভার্স বলছে

'ঠিক বলতে পারছি না·· বেস থেকে বোধহয় ২২৫ মাইল উত্তর পূর্বে উড়ছি··· মনে হচ্ছে আমরা··· ।'

আর কিছু শোনা গেল না। দাঁতে দাঁত চেপে কসনার কথাগুলো শুনল। গ্যালিভান এবং গ্রুবেল তো স্টিভার্সের প্লেনেই আছে। তারও তো এই ফ্লাইটে যাবার কথা ছিল। ওরা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

বেতার যোগাযোগ হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কোনো কথা শোনাও যাচ্ছে না, বলাও যাচ্ছে না।

সকলে কান খাড়া করে আছে।

স্টিভার্সের শেষ কথা শোনা গেল। ক্ষীণ।

আমরা কি জলে পড়ে যাচ্ছি ? আমরা একেবারে হারিয়ে গেছি।

'উই আর কমপ্লিটলি লস্ট'।

স্টিভার্সের শেষ কথা। তারপর ডেড সাইলেন্স। কোনো পাইলটের আর কোনো

কথাই শোনা গেল না। টাওয়ার থেকে রেডিও অপারেটররা অনেক চেষ্টা করল কিন্তু বৃথা।

ফ্লাইট নাম্বার নাইনটিন টেক অফ করার পর দু' ঘণ্টা সতেরো মিনিট কেটে গেছে। স্টিভার্সের পর আর কোনো আওয়াজ শোনা যায় নি।

ফোর্ট লডারডেলের উত্তরে ১৫০ মাইল দূরে আরও একটি এয়ার বেস আছে। এইটির নাম ব্যানানা রিভার নেভাল এয়ার স্টেশন। বর্তমানে নাম পালটে গেছে। এখন নাম প্যাট্রিক এয়ারফোর্স বেস।

পাঁচখানি নিরুদ্দিষ্ট অ্যাভেঞ্জার বিমানের সন্ধানে এখনই একটি উপযুক্ত বিমান পাঠান দরকার। সেই রকম বিমান এই ব্যানানা রিভার বেসে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

ইতিমধ্যে বেতার মারফত সমুদ্রে সমস্ত জাহাজ ও আকাশে উড়ন্ত বিমানগুলিকে খবরটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনুরোধ করা হয়েছে যে অ্যাভেঞ্জারের কোনো খবর পেলে যে কোনো এয়ার বেসে যেন জানানো হয়। ওদিকে কোস্ট গার্ডরা খবর পাওয়া মাত্র সারারাত্রি ধরে চষে দিয়ে বেড়াতে লাগল।

এদিকে সন্ধ্যা ৭ টা ৫ মিনিটে কণ্ট্রোল টাওয়ারের রেডিওতে সংকেত শোনা গেল। নিঃসন্দেহে একটি অ্যাভেঞ্জার তার সংকেত ধ্বনি জানাচ্ছে। "এফ টি এফ টি..." ঐ দু'বার মাত্র, আর নয়। এফ টি সংকেত ধ্বনি ১৯ নম্বর ফ্লাইটের অ্যাভেঞ্জার বিমান ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। সেই রকমই নির্দেশ।

কিন্তু কোথা থেকে সেই সাংকেতিক ধ্বনি প্রেরিত হলো।

ব্যানানা রিভার এয়ার বেসে লেফটেনাণ্ট হ্যারি খবর পাওয়া মাত্র দমকলের মতো দ্রুতবেগে তিনি এবং বারোজন বৈমানিক বিরাট মার্টিন মেরিনার পি বি এম উড়ন্ত জাহাজ নিয়ে আকাশে উঠলেন।

যদি কোনো বিমান বা বৈমানিক সমুদ্রে পড়ে যায় তাহলে তাদের উদ্ধারের জন্যেই মার্টিন মেরিনার বিমান বিশেষভাবে তৈরি। এই বিমানের ডানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মাপ হলো ১২৪ ফুট।

মার্টিন মেরিনার শান্ত বা অশান্ত সমুদ্রে সহজে নামতে পারে এবং এমন ভাবে তৈরি যে কিছুতেই ডুববে না। বিমানে রবারের নৌকো আছে, অতি সহজেই জলে ভাসান যায়। এমন ওয়াটারপ্রুফ রেডিও ট্রান্সমিটার আছে যে জলের সংস্পর্শে এলেই তা বিপদসূচক সংকেত পাঠাতে থাকবে।

বিমানে যে পরিমাণ তেল থাকে তার দ্বারা সে চব্বিশ ঘণ্টা অকোশে উড়তে পারে।

ফোর্ট লডারডেল কণ্ট্রোল টাওয়ার থেকে অ্যাভেঞ্জারের বৈমানিকদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠানো হলো, সাহায্য যাচ্ছে। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। আশা নেই তবুও খোঁজ

করতে হবে।

মার্টিন মেরিনার আকাশে উঠলো। অ্যাভেঞ্জার বিমান শেষ যে স্থান থেকে বিপদ সংকেত পাঠিয়েছিল অনুমান করে সেই দিকেই বিমান ছুটে চলল। সেখানে কিছুই নেই। না থাকাই সম্ভব। বিস্তৃত অঞ্চল খুঁজে বেড়াল মার্টিন মেরিনার।

এদিকে মার্টিন মেরিনার বেতার বার্তা তাদের নিজেদের অবস্থান জানিয়ে মাঝে মাঝে রিপোর্ট করছে, কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

তারপর? তারপর রহস্যজনক ভাবে মার্টিন মেরিনারও নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মার্টিন মেরিনারও কোথায় যেন হারিয়ে গেল। রেডিও যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

মার্টিন মেরিনার আকাশ থেকেই কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। জলে পড়লে তাকে পাওয়া যেত। অ্যাভেঞ্জার বিমান জলে পড়লে টুপ করে ডুবে যায় তবুও প্রাণ বাঁচাবার জন্যে উপকরণসহ রবারের নৌকো অ্যাভেঞ্জারে থাকে এবং সেগুলি কি করে ব্যবহার করতে হয় তা বৈমানিকদের উত্তমরূপে জানা আছে।

কিন্তু মেরিনার তো জলে পড়লে ডুববে না আর ডুবতে থাকলেও যে বেতারবার্তা পাঠাতে পারবে সে ব্যবস্থা আছে। অ্যাভেঞ্জারের মতো সমুদ্রে ডুবতে পারে না। অসম্ভব, আকাশই তাকে খেয়েছে।

কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে রেডিও অপারেটররা নিরন্তর বার্তা পাঠিয়ে যাচ্ছে। কোনো সাড়া পাচ্ছে না। এমন অসম্ভব ঘটনা কখনও ঘটে নি। তিন বন্ধুর বাকি বন্ধু কসনার লডারডেল কন্ট্রোল টাওয়ারে মুখ শুকিয়ে চুপটি করে বসে আছে। এই তো কয়েক ঘণ্টা আগে তার বন্ধু দু'জন 'সো লং' বলে বিদায় নিয়ে গেল। আর সেই 'সো লং' এমন নিষ্ঠুরভাবে সত্য হলো? এই ঘটনার চাব্বিশ বছর পরে বেচারী একবার ফোর্ট লডারডেলে এসেছিল যখন ফ্লাইট নাম্বার নাইনটিন নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করা হলো।

পরদিন সকাল হতেই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার 'সলোমন'কে সমুদ্রে পাঠান হলো। সলোমনের ডেক থেকে বিমানের পর বিমান আকাশে উঠে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

বাহামা থেকে ব্রিটেনের রয়েল এয়ার ফোরসের বিমানবহরও অনুসন্ধানে যোগ দিলো, এছাড়া কোস্টগার্ড এবং সমুদ্রে ভাসমান অন্যান্য জাহাজ তো আছেই।

ফ্লোরিডার বনজঙ্গল খুঁজে দেখবার জন্যেও বারোটি সার্চপার্টি পাঠান হলো কিন্তু কোথায় কি? মোট তিন'শ বিমান খুব নিচুতে নেমে তন্ন-তন্ন করে জল আর মাটি খুঁজতে লাগল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে একজন লোকও এক টুকরো খবরও দিতে পারল না।

একটি নেভাল বোর্ট অফ ইনকুয়ারি বসেছিল। তারা সম্ভাব্য সকল দিক থেকে ঘটনাটি বিচার করেছিলেন কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে তারা কিছুই অনুমান করতে পারছেন না।

ঐ বোর্ডের একজন মেম্বার পরে বলেছিলেন : তারা এমন ভাবেই হারিয়ে গেল যেন তারা মঙ্গল গ্রহেই চলে গেছে। পাঁচখানা অ্যাভেঞ্জার বিমানের বা মার্টিন মেরিনারের একজনও নিশ্চয় বেঁচে নেই কিন্তু তারা গেল কোথায় ?

এর একমাত্র উত্তর : জবাব নেই। আকাশে কোথাও একটা ফাঁদ আছে। সেই ফাঁদের মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে আর বেরোন যায় না। সেখান থেকে কেউ ফিরতে পারে না।

আকাশে ফাঁদ পাতা আছে ? আকাশ যেমন বিরাট তার ক্ষিধেও তেমনি প্রচণ্ড। পাঁচটা অ্যাভেঞ্জার, ডন্টলেস, হেলডাইভার, গ্লোবমাস্টার, সুপার ফর্ট্রেস, মেরিনার, ডিস থ্রি, এমনি সব বিমান খেয়ে তার ক্ষিধে মিটছে না। পরপর বিমান সে খেয়েই চলেছে এবং এখনও। এই সেদিন তো আস্ত একটা বেলুন গিলে ফেলল।

অ্যাভেঞ্জারের ঘটনার ছাব্বিশ মাস পরে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি। এই তারিখে বারমুডার ওপরের আকাশে একখানা বিমান গিললো, একখানা যাত্রীবাহী বিমান। আবার এক বছরের মধ্যে ঐ একই কোম্পানির আর একখানা যাত্রীবাহী বিমান।

বিমানখানা হলো ব্রিটিশ সাউথ আমেরিকান এয়ারওয়েজ কোম্পানির (বি ও এ সি) ট্যুডর ফোর জাতীয় এঞ্জিনের বিলাসবহুল এয়ার লাইনার।

ভোর বেলায় বাইশ জন যাত্রী আর ছ জন ক্রু নিয়ে বিমানখানা যার নাম 'স্টার টাইগার' লণ্ডন এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু করল। প্রথম স্টপ লিসবন, তারপর সান্টা মেরিয়া অ্যাজোরস, তারপর হ্যামিলটন এবং তারপর বারমুডা।

হ্যামিলটন ছাড়িয়ে 'স্টার টাইগার' জোর বাতাসের মুখে পড়ল। গতি কমে গেল।

বেলা সাড়ে দশটায় অ্যাজোরস ছাড়বার পর বিমানের ক্যাপটেন ডেভিড কোলবি বারমুডা টাওয়ারকে বেতার বার্তা পাঠাল যে তার বিমান হ্যামিলটনে ল্যাণ্ড করতে ঘণ্টা দেড়েক দেরি করবে।

বেলা একটার সময় বারমুডা টাওয়ারকে আবার জানাল যে এখনও সে বারমুডা থেকে ৪৪০ মাইল উত্তরপূর্বে জোর বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

এই জোর বাতাস ছাড়া ক্যাপটেন ডেভিড কোলবি আর কোনো বিপদের উল্লেখ করে নি। অর্থাৎ বাতাস ছাড়া তার আর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। আকাশ পরিষ্কার, যান্ত্রিক কোনো গোলযোগও নেই।

এই বার্তা পাঠাবার পরই কোনও গোলমালও হয়েছিল নিশ্চয়। স্টার টাইগার আর কোনো বার্তা পাঠায় নি। বারমুডা টাওয়ারও তার সঙ্গে বেতার যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছিল। স্টার টাইগার কোনোদিনই আর বারমুডা পৌছয় নি। নিরুদ্দেশ।

পাঁচদিন ধরে বিমান ও জাহাজ স্টার টাইগারের কোনো সন্ধান পেল না। এইভাবে নিরুদ্দেশ হওয়ার কোনো কারণও খুঁজে পাওয়া গেল না। রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। এরপর উল্লেখযোগ্য রহস্য পুয়েরটো রিকো থেকে মিয়ামি যাওয়ার পথে ডিসি-থ্রি নিখোঁজ। সে রহস্য এই বইয়ের গোড়াতেই বলা হয়েছে।

স্টার টাইগারের পর স্টার এরিয়েল। ডিসি-থ্রি-এর রহস্যের মাস খানেক পরেই সেই ভুডু আকাশ আবার জানিয়ে দিলো সে আছে। আকাশ নিয়ে কাব্য করলে কি হবে এ বড় সাংঘাতিক মহাশূন্য।

সেই আকাশ স্টার টাইগারকে তো আগেই গ্রাস করেছে, এবার সেই একই কোম্পানির সেই একই ধরনের ট্যুডর ফোর বিমান। নামটাও প্রায় এক। এখানকার নাম 'স্টার এরিয়েল।' স্টার টাইগার যেখানে ভ্যানিশ হয়েছিল বলে মনে হয় এখানে তার কয়েকশত মাইলের মধ্যেই অদৃশ্য হলো।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'খোলো খোলো হে আকাশ'। কে জানে আকাশের এই অংশটা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সাড়া দিয়ে ফটক খুলতে আরম্ভ করেছিল। ফটকের মধ্যে দিয়ে এক একখানা বিমান ঢোকে আর ফটক বন্ধ হয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যায়, কে জানে। ফটকের ভেতর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, কেউ ঢুকতেও পারে না।

১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে ব্রিটিশ সাউথ আমেরিকান এয়ারওয়েজ কোম্পানির এয়ার লাইনার 'স্টার এরিয়েল', সকাল পৌনে আটটায় বারমুডা থেকে টেক অফ করল যাবে চিলির সান্টিয়াগো পর্যন্ত, পথে জ্যামাইকায় কিংস্টনে থামবে। বিমানে ছিল তেরোজন যাত্রী (আনলাকি থারটিন নাকি?) আর সাতজন ক্রু। কমাণ্ডারের নাম হলো ক্যাপটেন জে সি ম্যাকফি।

বারমুডা ছাড়বার আগে বিমানখানা ভালো করে চেক করা হয়েছিল এবং তেল থাকা সত্ত্বেও রিজার্ভ ট্যাংকে তেল ভরে নেওয়া হয়েছিল যাতে দরকার হলে প্লেন আরও দশ ঘণ্টা আকাশে উড়তে পারবে।

বেলা ৮টা ২৫ মিনিটে বারমুডা টাওয়ার নিম্নোক্ত বেতারবার্তা পেল: 'এরিয়েল' থেকে ক্যাপটেন ম্যাকফি বলছি। আমরা এখন বারমুডা থেকে কিংস্টনের দিকে উড়ে চলেছি। ফেয়ার ওয়েদার। কিংস্টনে ঠিক সময়ে পৌছব আশা করছি।

এই হলো ক্যাপটেন ম্যাকফি-এর জীবনের শেষ বেতারবার্তা। এরপর আর কোনো-দিনই কোনো বার্তা পাঠাতে পারেন নি। তাঁর সঙ্গে তাঁর এরিয়েলও কোথায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করল কে জানে?

সেই সময়ে ইউ এস নেভির টাস্ক ফোর্স ঐ অঞ্চলে মহড়া দিচ্ছিল অতএব সঙ্গে সঙ্গে জোর অনুসন্ধান কাজ আরম্ভ হয়েছিল।

আশ্চর্যের ব্যাপার বিমানখানা যদি সমুদ্রে পড়ে ডুবে যাবে তাহলে আগে তার দুই দিকের ডানার ভেতর দিকে রক্ষিত রবারের দু'খানা লাইফবোট আপনা আপনি খুলে বেরিয়ে এসে জলে ভাসতে থাকবে। সে দু'খানাই বা গেল কোথায়? তাহলে এরিয়েল জলে পড়ে নি। কিন্তু গেল কোথায়?

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার। বিমান কোম্পানি দক্ষিণ আমেরিকা রুট থেকে ট্যুডর বিমানগুলি তুলে নিলেন অথচ তারা পৃথিবীর অন্য অঞ্চলে দিব্যি উড়ে বেড়াচ্ছে। কোনো গোলমাল নেই। অথচ ঐ দু'খানা এবং অন্যান্য ট্যুডর-ফোর বিমানে কোনো যান্ত্রিক গোলমাল থাকবার কথা নয়, থাকেও না। প্রতি বিমানে সুদক্ষ পাইলট দেওয়া হয়।

আবহাওয়া উত্তম থাকা সত্ত্বেও তার অ্যাভেঞ্জারের মতো কোথায় চলে গেল তার খবর কে বলবে।

আকাশেও বিমানে তেল ভরে দেবার জন্যে এরিয়াল অয়েল ট্যাংকার আছে। এরা আকাশে উঠে পাইপের সাহায্যে অন্য বিমানের অয়েল ট্যাংকে তেল ভরে দিয়ে আবার নিচে ফিরে আসে।

কেবি-ফিফটি হলো আমেরিকান এয়ার ফোর্সের এইরকম একটি এরিয়াল অয়েল ট্যাংকার।

১৯৬৩ সালের ৮ জানুয়ারী তারিখে ছয় এঞ্জিনযুক্ত একটি কেবি ফিফটি অয়েল ট্যাংকার ভারজিনিয়া স্টেটের ল্যাংলি এয়ারফোর্স বেস থেকে বেলা ১১ টা ১৭ মিনিটে টেকঅফ করল। তার গন্তব্য স্থল অ্যাজোরস দ্বীপে ল্যাজেস ফিল্ড। পৌঁছবার কথা সন্ধ্যা ৬টা ৫৯ মিনিটে।

বিমানের কমাণ্ডার ছিলেন মেজর রবার্ট টনি। চার হাজার ঘণ্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা তাঁর আছে এবং কেবি-ফিফটি বিমান পরিচালনার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন গত একবছর আগে। এককথায় মেজর টনি অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ পাইলট।

দুপুর নাগাদ তিনি বিপদসূচক বার্তা পাঠান। তিনি বলেন যে তিনি এখন কেপ চার্লসের ২৫০ মাইল পুব দিকে উড়ছেন। তিনি বিপদে পড়েছেন। কি বিপদ তা

স্পষ্ট বোঝা যায় নি কারণ প্রেরিত বেতারবার্তা বেশ দুর্বল ছিল, ভালো শোনা যাচ্ছিল না।

নির্ধারিত সময়ে বিমানখানি যখন ল্যাজেস ফিল্ডে পৌছল না তখনই অনুসন্ধান আরম্ভ করা হলো এবং এর পর ছ'দিন ধরে আকাশ, সমুদ্র ও বিস্তীর্ণ ভূভাগ তোলপাড় করা হলো কিন্তু কেবি-ফিফটি প্লেনখানির কোনো হদিস হলো না।

কোস্ট গার্ডরা বিমানখানির গতিপথে এক জায়গায় তেল ভাসতে দেখেছিল কিন্তু সেই তেল যে কেবি-ফিফটি প্লেনের তা কে বলবে?

গ্রহান্তরের যান? সবই যেন ধাঁধা। ধাঁধাগুলির উত্তরও মিলছে না। কোনো সমাধানও করা যাচ্ছে না।

ফ্লাইং সসার বা অনুরূপ মহাশূন্যচারী কোনো বস্তু যাদের বলা হচ্ছে ইউএফও অর্থাৎ আন-আইডেনটিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট তাদেরও টেনে আনা হচ্ছে।

হোমস্টেড এয়ারফোর্স বেস থেকে গ্র্যাণ্ড টুর্ক দ্বীপে যাবার পথে আমেরিকান এয়ারফোর্সের সি-১১৯ ফ্লাইং বক্সকার অভিহিত একটি কার্গো প্লেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। হারিয়ে যাবার আগে প্লেনখানা ঠিক ল্যাণ্ড করবার সময়ে গ্র্যাণ্ড টুর্ক টাওয়ারের অপারেটর একটা অস্পষ্ট বার্তা পেয়েছিল। পাইলট কি বলতে চেয়েছিল তা বোঝা যায় নি।

জেমিনি-ফোর মহাকাশযানের আকাশচারীরা এই সময়ে মহাশূন্যে একটি ইউ-এফও দেখেছিলেন। কেউ অনুমান করছেন যে সেই ইউএফও ফ্লাইং বক্সকার প্লেনখানা গ্রাস করেছে।

আবার একটা মজা আছে। বৈমানিকেরা হারানো প্লেন নিয়ে আলোচনা করতে চায় না বিশেষ করে বাইরের লোকের সঙ্গে, সেইজন্যে অনেক তথ্য অজ্ঞাত থেকে যায়।

১৯৬৫ সালের ৭ জুন সোমবার তারিখের মিয়ামি হেরাল্ড খবর দিচ্ছে:—হারিয়ে যাওয়া এয়ারফোর্সের সি-১১৯ ফ্লাইং বক্সকার প্লেনখানার জন্যে রবিবার দিন ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে···প্লেনখানায় দশজন লোক ছিল···।

কোস্ট গার্ড অনুমান করছে যে মিয়ামি থেকে ২৮০ মাইল দূরে সাউথ বাহামা সমুদ্রে প্লেনখানা নিখোঁজ হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে দুই এঞ্জিনের বিরাট এই প্লেনখানা হোমস্টেড এয়ারফোর্স বেস থেকে টেকঅফ করেছিল···

এই প্লেনখানির মূল আড্ডা হলো মিলওয়াকি স্টেটে বিল মিচেল এয়ারফোর্স বেস। বিমানের বিভিন্ন অংশ বোঝাই করে গ্র্যাণ্ড টুর্ক যাবার উদ্দেশ্যে সি-১১৯ প্লেনখানা

শনিবার সকালে হোমস্টেড বিমান ঘাঁটিতে ল্যাণ্ড করেছিল···

হোমস্টেড বিমানঘাঁটির একজন মুখপাত্র বলেন যে গতকাল সন্ধ্যার পর বিমানখানা থেকে কোনো বার্তা পাওয়া যায় নি···

শনিবার রাত্রি ১১টা ২৩ মিনিটে সি-১১৯-এর গ্র্যাণ্ড টুর্ক ইনস্টলেশনে নামবার কথা।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আটলান্টিক সমুদ্রে ২০০০ স্কোয়ার মাইল জুড়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছে।

মিয়ামি হেরাল্ড মঙ্গলবার, জুন ৮, ১৯৬৫

১০ জন বৈমানিকসহ নিখোঁজ এয়ারফোর্স প্লেনখানি তার গন্তব্যস্থল বাহামা থেকে আর ৪৫ মিনিট বাকি থাকতে রহস্যজনকভাবে কোথায় হারিয়ে গেছে···

দক্ষিণ বাহামার ক্রুকেড আইল্যাণ্ডের কাছে অর্থাৎ তার গন্তব্যস্থল গ্র্যাণ্ড টুর্ক এয়ার-ফোর্স ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ থেকে মাত্র ১০০ মাইল দূর থেকে বেলা ১১টার সময় দুই এঞ্জিনের সেই বৃহৎ প্লেন তার শেষ রেডিও যোগাযোগ করেছিল।

'প্লেনটি যে বিপদে পড়েছে এমন কোনো ইঙ্গিত করে নি এবং তারপর আর কিছু শোনা যায় নি'—এ কথা বলেছেন মিয়ামির একজন কোস্ট গার্ড। সম্ভবত প্লেনটি দিকভ্রষ্ট হয়ে গন্তব্যপথ অতিক্রম করে অন্যত্র চলে গেছে···

সোমবার থেকে অনুসন্ধানকারীরা ১০০,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত সেই এলাকাতে অনুসন্ধান চালাচ্ছে যে এলাকাটি অভিজ্ঞ পাইলটরা বারমুডা ট্র্যাঙ্গল নামে অভিহিত করে···

এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রাঞ্চলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শত শত বিমান, জাহাজ এবং সাব-মেরিন নিমজ্জিত হয়েছে···তারপরও বেশ কিছু বিমান রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়েছে।

হোমস্টেডের একজন প্রবীণ পাইলট বলেন 'বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, যে সমস্ত প্লেন সাউথ বাহামায় যায় তারা কোথায় যে যায় তা কেউ বলতে পারে না, ওগুলি আর ফিরে আসে না।'

সি-১১৯-এর ব্যাপারটাও তাই—ধ্বংসাবশেষ বলতে কিছুই পাওয়া যায় নি এবং জীবনের কোনো লক্ষণ কোথাও দেখা যায় নি। রবিবার রাত্রেও সাতখানা বিমান ওকে খুঁজে বেড়িয়েছে, আলোর সংকেতটুকুও কোথাও দেখা যায় নি।

১০ জুন বৃহস্পতিবার থেকে অনুসন্ধান কাজ প্রত্যাহার করা হলো।

বিমানখানার দুখানা এঞ্জিন ছিল। একখানা এঞ্জিন খারাপ হলেও রেডিও মারফত

সেটা তো জানানো যেত কিন্তু তা জানানো হয় নি। তবে কি আকস্মিক বিস্ফোরণ? তাহলে তো সমুদ্রে ধ্বংসাবশেষ ভাসতে দেখা যেত। না, কোনো সূত্রই পাওয়া যায় নি।

১৯৭৩ সালের শেষের দিকে ইণ্টারন্যাশনাল ইউএফও ব্যুরো কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। সেইসব প্রবন্ধের একটিতে এরকম সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে যে সি-১১৯ বন্ধুকার বিমান হয়তো কোনো উড়ন্ত চাকীর কবলে পড়েছিল।

সন্দেহের কারণ আছে।

সি-১১৯ যে সময়ে অদৃশ্য হয় সেই সময়ে জেমিনী ফোর মহাশূন্য পরিক্রমা করছিল এবং অ্যাস্ট্রোনট জেমস ম্যাকডেভিট বাহু বিশিষ্ট একটি উড়ন্ত বস্তু দেখেছিল। কয়েক মিনিট পরে ম্যাকডেভিট এবং এড হোয়াইট আর একটি রহস্যজনক উড়ন্ত বস্তু দেখে বিস্মিত হয় এবং সেটি দেখেছিল ক্যারিবিয়ান সাগরের ওপরে অর্থাৎ বারমুডা ট্রাঙ্গল এলাকায়। ওরা দু'জনেই নিশ্চিত যে বস্তুটি অন্য কোনো উপগ্রহ (স্যাটিলাইট) নয়।

ম্যাকডেভিট বলেছেন যে সেই উড়ন্ত বস্তুটি থেকে যেন একটি বাহু প্রসারিত হচ্ছিল। একজন অনুমান করেছিলেন যে সেই উড়ন্ত বস্তুটি সম্ভবত রিবাট স্যাটেলাইট পেগেসাস-টু যার ৯৬ ফুট দীর্ঘ বাহুর মতো একটি অ্যানটেনা আছে কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল যে জেমিনী ফোর-এর কক্ষপথ থেকে সেটি তখন অন্তত হাজার মাইল দূরে নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরছিল।

এই রহস্য সমাধানের জন্য 'দি বারমুডা ট্রাঙ্গল মিস্ট্রি—সলভড' বইয়ের লেখক লরেন্স ডেভিড কুশচে অ্যাস্ট্রোনট জেমস ম্যাকডেভিটকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। ম্যাকডেভিট সেই চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন যে তিনি একটি রহস্যজনক উড়ন্ত বস্তু দেখেছিলেন বলে বিশ্বাস করেন। তাঁর চিঠিখানি নিচে তুলে দেওয়া হলো :

In reply to your letter of January 22, I would like to say that during my flight of Gemini 4 I did indeed see what some people would call a UFO. I think it is important to realize that the letters U F O stand for Unidentified Flying Object.

The object which I saw remains unidentified. This does not mean that it is, therefore a spacecraft from some remote planet in the universe. It also doesn't mean that it isn't such a spacecraft. It only means that I saw something in flight which neither I nor any one else was ever able to identify.

বাহামার ন্যাসো এয়ার ফিল্ডের কণ্ট্রোল টাওয়ারের রেডিও অপারেটর একজন বৈমানিকের কাছ থেকে একদিন ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট বার্তা পেলেন।

সেদিন আকাশ ছিল খুব পরিষ্কার। কোথাও এক খণ্ড মেঘ ছিল না। এমন আকাশে বৈমানিকেরা নাকি বিনা কম্পাসের সাহায্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

কিন্তু এই বৈমানিক নাকি দিকভ্রান্ত হয়েছেন। ন্যাসো টাওয়ার বৈমানিককে তার অবস্থান জানিয়ে দিলো কিন্তু বৈমানিক নাকি তবুও তার রাস্তা ধরতে পারল না। সে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল সে কোন্ দিকে যাবে?

কণ্ট্রোল টাওয়ারের অপারেটরের মনে হলো যে সেই বৈমানিক যেন বলছে সে ঘন কুয়াশার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। অথচ সেদিন সেই দূরত্বে কুয়াশা হয় নি।

কি ব্যাপার কিছু বোঝা গেল না কারণ বৈমানিকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার কোনো পাত্তাও পাওয়া যায় নি। ভবিষ্যতে তাকে বা তার বিমানকে কোথাও দেখা যায় নি।

পরপর অনেক বিমান নিখোঁজ হলো, ইউ এস সুপারফট্রেস, ব্রিটিশ আর্মির সৈন্যবাহী বিমান, ইউ এস নেভির বিমান এবং আরও ছোট বড় অনেক বিমান ফ্লোরিডার উত্তর ও দক্ষিণে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

৮

মাছ ধরতে বেশ মজা কিন্তু তারপর? কি সাংঘাতিক! সমুদ্রের গভীরে যে দৈত্য বাস করে সে যে কোনো সময়ে হাত বাড়িয়ে মাছ, মানুষ, ট্রলার সব টেনে নেয়! জাপানী ধীবর।

অন্য সমুদ্র অন্য রহস্য

কি বিজ্ঞানী কি অবিজ্ঞানী অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল। কেউ চেষ্টা করছেন প্রমাণ করতে যে ঐ ত্রিকোণে কিছুই নেই, যা ঘটেছে তা কাকতালীয়বৎ ঘটনা। আকাশে ও সমুদ্রে অনেক ঘটনা ঘটে যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আর কেউ বলছেন যে তোমরা রহস্যের সমাধান করতে পারছ না তাই সবকিছু উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছ। বারমুডা ট্র্যাঙ্গল রহস্যের কোনো কূলকিনারা তো করতে পারলেই না ওদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে যে আর এক রহস্য উঁকি মারছে তার কি

ব্যাখ্যা কর দেখা যাবে।

জাপান থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা হালে 'ডেভিলস সি' নামে কুখ্যাতি অর্জন করেছে।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল যেমন মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ পূর্বে, এই ডেভিলস সি-ও তেমনি জাপান ভূখণ্ডের দক্ষিণ পূর্বে। শয়তানের এই সমুদ্রে বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের মতো বহু জাহাজ রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছে।

জাপানীরা মাথা ঘামায় নি। যে সব জেলে মাছ ধরতে যায় তারা তাদের বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে বলে আসছে যে সমুদ্রে ঝড় জল উপেক্ষা করে মাছ ধরতে যেমন উত্তেজনা ও আনন্দ আছে তেমনি বিপদও আছে। সমুদ্রের গভীরে যে বিশাল দৈত্য আছেন, কখন তাঁর দয়া হলো, তিনি তাঁর একটা হাত বাড়িয়ে সবসুদ্ধ টেনে নিলেন, মাছ, মানুষ, ট্রলার, সব কোথায় তলিয়ে গেল কে জানে।

এই সকল ধীবরেরা বিশ্বাস করে যে সমুদ্রের নিচে শয়তানেরা বাস করে তবে কি রকম তাদের চেহারা তা তারা বলতে পারে না কারণ যারা তাকে দেখেছে তারা তো কেউ ফিরে আসে নি।

এই কিংবদন্তীকে জাপান সরকার প্রথমে কান দেয় নি। সমুদ্রের যে সব অঞ্চলে জেলেরা মাছ ধরতে যায় তার অনেক এলাকাতে মাঝে মাঝে দারুণ ঝড় হয়, বিরাট ঢেউ নিয়ে সামুদ্রিক জোয়ার, যাকে জাপানীরা বলে 'সুনামি' দেখা দেয়।

এই ঝড় ও জোয়ারের মুখে মাছ ধরা নৌকো পড়লে তারা তো ডুবে যাবেই, এ আর নতুন কথা কি?

কিন্তু ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪-এর মধ্যে বেশ কয়েকখানা জাহাজ ডুবে গেল তখন সরকার চিন্তিত হলেন। এগুলো সত্যিই জাহাজ এবং আধুনিক। বেশির ভাগ মালবাহী। তাদের এঞ্জিন ভালো, বার্তা আদান-প্রদানের জন্যে রেডিও আছে। বিপদের সময় সংকেত পাঠাতে পারে তবুও তারা শান্ত সমুদ্রে কোথায় হারিয়ে গেল।

এইভাবে ন'খানা জাহাজ নিখোঁজ হলো। এদের মধ্যে কেবল একটি মাত্র জাহাজ বিপদ সংকেত পাঠিয়েছিল কিন্তু কিছু করবার আগেই সে জাহাজ নিরুদ্দেশ!

রহস্যের সন্ধানের জন্যে জাপান সরকার একখানা জাহাজ পাঠালেন। জাহাজের নাম "কাইয়ো মারু।' জাহাজে বিজ্ঞানীরা ছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামও ছিল। থাকলে কি হবে? সেই জাহাজখানাই তো ডুবে গেল তবে কারণটা জানা গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা স্বীকার করলেন যে সমুদ্রের গভীরে সত্যিই একটা বা একাধিক বিশালকায় দৈত্য বা দানব আছে কিন্তু তাদের নাম হলো আগ্নেয়গিরি।

সমুদ্রের গভীরে সেই আগ্নেয়গিরির যখন অগ্নি উদ্গীরণ আরম্ভ হয় এবং সমুদ্রের যে

প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয় তখন তারই ফলে জেলে ডিঙি থেকে আরম্ভ করে বড় জাহাজও ডুবে যায়।

সমুদ্রের এই এলাকায় যেসব আগ্নেয়গিরি আছে সেই এলাকার নাম হলো ফুজি ভল-ক্যানিক জোন। আর তারাই ঘটায় এই 'আর্থকোয়েক' নয় 'সিকোয়েক'।

জাপানের দক্ষিণ পূর্বে ইজু পেনিনসুলা থেকে আরম্ভ করে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সারি সারি আগ্নেয়গিরি আছে। এইসব আগ্নেয়-গিরির মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপটির নাম হলো ইয়ো জিমা।

আগ্নেয়গিরি যখন ক্ষেপে ওঠে তখন সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে 'সুনামি' তার সর্বনাশ নিয়ে হাজির হয়। সে কি বিশাল ঢেউ। ২০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয় নাকি। সেই ঢেউ, মাছ ধরার ট্রলার তো দূরের কথা, জাহাজকেই গ্রাস করে ফেলে। এই ঢেউয়ের সামনে যা কিছু পড়ে তারাই খড়কুটোর মতো কোথায় ভেসে যায় কে জানে। জেলেদের নৌকো বা জাহাজ হারানোর রহস্য সমুদ্রের দানব নয়, সেই রহস্যের নায়ক হলো এই 'সুনামি' যে দীর্ঘদিন ধরে জাহাজ বা নৌকো খেয়ে আসছে। বিজ্ঞানীরা এই কথা বলেন।

কিন্তু সুনামি তো আর সব সময়েই হচ্ছে না। বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের মতো শান্ত সমুদ্রে যে জাহাজ নিখোঁজ হচ্ছে? তখন নাকি বিজ্ঞানীরা নিরুত্তর থাকেন এবং 'ডেভিলস সি' নামে শয়তানের সেই সাগরের অস্তিত্বই তারা অস্বীকার করেন।

অস্তিত্ব স্বীকার করলে হবে কি? ১৯৫২ সালের কথাই ধরা যাক। সেই বছর ইলেভেনথ মিয়োজিন মারু নামে একখানা মাছধরা নৌকো বন্দরে ফিরে এসে বলল যে বেয়োনিজ দ্বীপের পুব দিকে সে দেখেছে সমুদ্রের একটা অঞ্চল গম্বুজের মতো উঁচু হয়ে গেছে।

এই সব জেলেদের কথা উপেক্ষা করা যায় না। সমুদ্রপৃষ্ঠ তাদের মুখস্থ। কোথাও কোনো তারতম্য দেখা দিলে তাদের নজর এড়ায় না। ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার।

এই এলাকাটা কিন্তু ঐ ডেভিলস সি-এর মধ্যে।

তিন দিনের ভেতর জাপানের মেরিন সেফটি ব্যুরো ঐ অঞ্চলের এস এস শিকিন নামে একখানা জাহাজ পাঠাল। এই জাহাজ জাপানের উপকূল রেখায় টহল দেয়। সমুদ্রের মধ্যে গম্বুজটা দেখবার জন্যে এবং কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে টোকিয়ো ইউনিভারসিটি অভ ফিসারিজ অ্যাণ্ড আর্থকোয়েক একটা জাহাজে করে একটা রিসার্চ পার্টি পাঠাল।

ঐ জাহাজে উক্ত ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানী ছাড়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ টোকিয়ো ইউনিভারসিটি, টোকিও ইউনিভারসিটি অফ এডুকেশন, টোকিও সায়েন্স মিউজিয়ম, ব্যুরো অফ ফিসারিজ-এর বিজ্ঞানীরা এবং আসাহি প্রেসের রিপোর্টারা ঐ জাহাজে ছিল।

জাহাজখানার নাম এস এস শিনিয়ো মারু।

বিজ্ঞানীর দল ঐ জাহাজে চেপে যাত্রা করল। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে অকুস্থলে গিয়ে তারা দেখল জেলেদের কথা ঠিক। বেয়োনিজ দ্বীপ থেকে মাইল পাঁচেক দূরে উত্তর পূর্ব দিকে সমুদ্রে নিমজ্জিত একটি আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে।

সেই জেলে যখন দেখেছিল তখন সেই আগ্নেয়গিরি সবে তার কাজ আরম্ভ করেছে অর্থাৎ সবে তার ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে, এখন সে জেগে উঠেছে, হাত পা ছুঁড়ছে, মাথা নাড়ছে। সমুদ্রে রীতিমতো দাপাদাপি আরম্ভ হয়ে গেছে।

এদিকে মেরিন সেফটি ব্যুরোর জাহাজখানা ফিরে এসেছে। তারা এসে রিপোর্ট করল যে সমুদ্রে একটা আগ্নেয়গিরি দেখা দিয়েছে, হলদে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তারা আরও বলল যে সমুদ্র ফুঁড়ে বিরাট একটা বাঁধ উঠছে।

শিনিয়ো মারু যখন পৌঁছল তখন বাঁধের দুটো মাথা জেগে উঠেছে। আগ্নেয়গিরি তখনও শান্ত হয় নি। গলিত পদার্থ ও ধোঁয়া সমানে বেরোচ্ছে। সিনিয়ো মারু রেডিও মারফত খবর পাঠাতে লাগল।

জাপানের হাইড্রোগ্রাফিক ব্যুরো নব আবিষ্কৃত সেই আগ্নেয়গিরির একটা নাম দিলেন ; মিয়োজিন শো।

নামকরণ তো হলো কিন্তু আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ বাড়তে লাগল। সমুদ্র অশান্ত হচ্ছে। আর থাকা নিরাপদ নয়। ঐ তারিখেই অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখেই শিনিয়ো মারু তার মুখ ঘোরালো এবং নিরাপদে বন্দরে ফিরে এলো। শিকিন জাহাজখানা তো আগেই ফিরে এসেছিল।

হাইড্রোগ্রাফিক ব্যুরো আগ্নেয়গিরির নামকরণ করে দায়িত্ব শেষ করে নি। তারাও ইতিমধ্যে কাইয়ো মারু নামে একখানা জাহাজ পাঠিয়েছে। এই জাহাজে বেশ কয়েকজন নামী বিজ্ঞানী ছিলেন।

২১ সেপ্টেম্বর জাহাজখানা টোকিও থেকে যাত্রা করেছিল। ফেরবার সময় হয়ে গেছে কিন্তু জাহাজ এখনও ফিরছে না। বিজ্ঞানীদের জন্য সকলে উদ্বিগ্ন। মোট ৩১ জন বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভূবিদ্যা, সমুদ্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে পৃথিবীখ্যাত।

আশ্চর্যের বিষয় যে রেডিও মারফত কোনো বার্তাই তারা পাঠায় নি। মৌন থাকার

কারণ কি? অথচ ফেরবার তারিখ পার হয়ে গেছে। শিকিন এবং শিনিয়ো মারু তো আগেই ফিরে এসেছে। তারাও কোনো খবর দিতে পারল না।

হাইড্রোগ্রাফিক ব্যুরো ঘোষণা করল, তাদের ফিফথ কাইয়ো মারু জাহাজখানা হারিয়ে গেছে। কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না! সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়ে গেল।

উদ্ধারকারী জাহাজ সমুদ্র এবং বিমান আকাশ ছেয়ে ফেলল। কিন্তু কোথায় সেই কাইয়ো মারু জাহাজ। ঐ জাহাজের কোনো লাইফবোট বা লাইফ-জ্যাকেট বা টুকরো অংশ বা মৃতদেহ কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

মিয়োজিন-শো একটু শান্ত হতে যখন তার কাছে জাহাজ যেতে পারল তখন কিছু ধ্বংসাবশেষ সমুদ্রে ভাসতে দেখা গেল। ধ্বংসাবশেষ মানে কাঠের টুকরো। সেগুলি ল্যাবরেটরিতে পাঠান হলো। পরীক্ষা করে দেখা গেল কাঠের গায়ে পিউমিস ফ্লেক লেগে আছে। পিউমিসের সূত্র নিশ্চয় সেই মিয়োজিন-শো আগ্নেয়গিরি।

কিন্তু ঐ কাঠের টুকরো কোন্ জাহাজের?

যাই হোক জাপান সরকার আর বিলম্ব করলেন না।

জাহাজের নিরুদ্দেশ রহস্য সমাধানের জন্যে একটা ফ্যাক্টফাইণ্ডিং বোর্ড গঠিত হলো। অনুসন্ধান কাজ সমাপ্ত করে বোর্ড সাব্যস্ত করল যে নব আবিষ্কৃত মিয়োজিন-শো নিমজ্জিত আগ্নেগিরির উদ্গীরণের সময় প্রলয়ংকরী সমুদ্রের কবলে পড়ে কাইয়ো মারু ধ্বংস হয়েছে।

জপানের সেণ্ট্রাল মিটিওরলজিক্যাল অবজারভেটারির একজন মুখপাত্র বললেন যে ঐ নিমজ্জিত আগ্নেয়গিরির ক্রেটার চুম্বকের মতো জাহাজখানাকে টেনে নিয়েছে। মেরিটাইম সেফটি বোর্ডের ডিরেক্টর য়োনেকিচি ইয়াগিসওআ বললেন সামুদ্রিক জোয়ার সুনামি জাহাজখানাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। বস্তুত আবহাওয়া অফিস থেকে জানা যায় যে ঠিক ঐ সময়ে সমুদ্রে সুনামি দেখা দিয়েছিল।

ঐ জাহাজে যে বিজ্ঞানী ও নাবিকরা একটি অজানা তথ্য অনুসন্ধানের জন্যে যাত্রা করে আর ফিরল না তার জন্যে সারা জাপান শোক পালন করল। এই শোচনীয় ও মর্মান্তিক ঘটনার জন্যে বিজ্ঞান-জগৎ অভিভূত কারণ ঐ জাহাজে বিশিষ্ট কয়েকজন বিজ্ঞানী ছিলেন।

টোকিয়ো ইউনিভারসিটি অফ ফিসারিজ অ্যাণ্ড আর্থকোয়েকের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ হিরোশি নিনো লিখলেন :

"এই জাহাজের যে সব বিজ্ঞানী ও নাবিকেরা স্বেচ্ছায় এই বিপদ সংকুল সমুদ্রে যাত্রা করেছিলেন ইতিহাস তাদের কোনোদিনই ভুলবে না। তাঁদের আত্মত্যাগ জাপানের বিজ্ঞান জগতে একটা বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে তথাপি তাঁদের জন্যে সমুদ্র বিজ্ঞানে

একটা নতুন পথ খুলে গেল।"

কিন্তু একটা প্রশ্ন। নতুন পথ কি সত্যিই খুলেছে? রহস্য সমাধানে কি সাহায্য করেছে? কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি যদিও জাপান সরকার সেই ডেভিলস-সি এলাকা বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছেন। রহস্য উদ্ঘাটনের কোনো সহায়তা করতে পারেন নি

টোকিয়োর একটি জাপানী সংস্থা যার নাম সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি এজেন্সি তারা কাইয়ো মারু জাহাজের রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছে। কতগুলি প্রশ্ন নিয়ে তারা আজও নড়াচড়া করছে।

একটা প্রশ্ন হলো যে জাহাজখানায় দুটি উত্তম রেডিও-প্রেরক যন্ত্র ছিল তথাপি বিপদে পড়ে জাহাজ কোনো বার্তা পাঠাতে পারল না কেন? দুটো যন্ত্রই কি একই সঙ্গে খারাপ হয়ে গেল? এও কি সম্ভব? যদি খারাপ হয়েই থাকে তাহলে কার বা কিসের প্রভাবে?

রেডিও অপারেটরের কাছ থেকে উপস্থিত বিপদ বা বিপদের পূর্বাভাস সম্বন্ধে কেউ কোনো বার্তা পায় নি।

তারপর প্রশ্ন; একটিও মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেল না কেন? সমুদ্রের তলদেশের জল যেখানে ওপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল সেখানে তো মৃতদেহ, জাহাজের ভাঙা অংশ বা অন্য কিছু ভাসতে দেখা স্বাভাবিক এবং দেখা যদিও বা পাওয়া যায় কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটা টুকরোও পাওয়া যায় নি।

আরও একটা আশ্চর্যের বিষয়। কাইয়ো মারু জাহাজে তিরিশ টন তেল ছিল কিন্তু এক লিটার তেলও ভাসতে দেখা যায় নি। অথচ এইসব ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা জাহাজ-ডুবির পর সমুদ্রপৃষ্ঠে তেল ভাসতে দেখা যায়।

উক্ত সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি এজেন্সি অনেক প্রশ্নের জবাব পায় নি। বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলেও তো এইরকম অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি।

ডেভিলস সি-এর ওপরের আকাশও রহস্য মুক্ত নয়। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চল বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। আর্থার গডফ্রে দুই এঞ্জিনযুক্ত একটি জেট প্লেনে চেপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছিলেন, এই কিছুদিন আগে এবং গডফ্রে সম্বন্ধে সংবাদ খবরের কাগজ ও রেডিও মারফত প্রচারিত হতো।

পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ করে দেশে ফিরে এক টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে গডফ্রে বলেন যে, "ডেভিল সি এলাকার ওপরে আকাশে উঠে আমি তাজ্জব! আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার প্লেন যখন সেই আতঙ্কজনক শয়তানের সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখন আমি দেখি কি আমার সব যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে।

না, প্লেনখানাই যা বিকল হয় নি কিন্তু দেখি কি রেডিও, কম্পাস, অয়েল গেজ সব বন্ধ, কেউ কাজ করছে না। প্লেন কিন্তু উড়ে চলেছে।

আমি তো নার্ভাস হয়ে পড়লুম। তেল ফুরিয়ে গেলেই তো গেছি। প্লেন যাচ্ছে বটে কিন্তু কোন্ দিকে তা তো বুঝতে পারছি না। এইভাবে একঘণ্টা চলল। তারপর দেখি আবার সব সচল হয়ে উঠেছে। রেডিও পিপ পিপ করছে, কম্পাস ও অয়েল গেজের কাঁটা ঘুরছে। ততক্ষণে শয়তান সমুদ্রও অতিক্রম করেছি।"

আথার গডফ্রে একজন নামী ব্যক্তি। টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে তিনি আজগুবি কাহিনী শোনাবেন না। বৈঠকী আড্ডায় বসে বললে কথা ছিল।

গডফ্রে আরও বলেছেন যে, "এই সব ট্র্যাঙ্গল, ডেভিলস সি, লিম্বো অফ দি লস্টগুলি গাঁজাখুরি মনে হতো কিন্তু এখন তো দেখছি যে কোথাও কিছু একটা আছে যার ব্যাখ্যা আমি করতে পারি নি।"

বারমুডা রয়েল গেজেটের ১৯৭১ সালের মে সংখ্যায় গডফ্রে সায়েবের অনুরূপ একটি ঘটনার বিবরণী ছাপা হয়েছে।

চারজন পাইলট তাদের বিমান নিয়ে যখন ডেভিলস সি-এর ওপরের আকাশ অতিক্রম করছিল সেই সময় দেড় ঘণ্টার জন্যে তাদের রেডিও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় যাকে বলে 'ডেড'। কোনো সাড়া শব্দ ছিল না।

যেমনি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তেমনি হঠাৎ আবার চালু হয়ে যায়, ততক্ষণে তারা শয়তান সাগর পার হয়েছে।

তাহলে এই বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এবং প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের কাছে ডেভিলস সি এলাকায় প্রাকৃতিক, অলৌকিক বা ভৌতিক একটা কিছু রহস্য আছে। না থাকলে এমন ঘটনা কি করে ঘটবে।

আরও রহস্যজনক এলাকা। এই রহস্য ভেদ করবার জন্যে অনেকেই তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। এদের মধ্যে আমেরিকার নিউ জারসির বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সোসাইটি ফর দি ইনভেসটিগেশন অফ দি আন এক্সপ্লেনড হলো অন্যতম। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন খ্যাতানামা মার্কিন বিজ্ঞানী আইভান টি স্যাণ্ডারসন।

স্যাণ্ডারসনের খেয়াল হলো আটলান্টিক মহাসাগরে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এবং প্রশান্ত মহাসাগরে ভেভিলস সি ব্যতীত ঐ রকম রহস্যজনক এলাকা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা যেখানে জাহাজ বা বিমান রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়, সেই রকম এলাকা খুঁজে বের করা।

বিজ্ঞানী স্যাণ্ডারসনের সোসাইটি কাজে লেগে গেল। সোসাইটিতে অনেক খ্যাতনামা সামুদ্রিক বিদ্যাবিশারদ, ভূগোলবিৎ ভূতাত্ত্বিক, গাণিতিক এবং অন্যান্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত

গবেষকও আছেন।

খোঁজ করতে করতে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পূর্বে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে, আর্জেনটিনা উপকূলের দক্ষিণ আটলান্টিকের দক্ষিণ পূর্বে, দক্ষিণ আফ্রিকা উপকূলের দক্ষিণ পূর্বে, ভারত মহাসাগরে, অস্ট্রেলিয়ার অদূরে টাসমান সমুদ্রে, ভারত মহাসাগরের পূর্ব দিকে এবং আফগানিস্থানে এই রকম দশটি রহস্যময় এলাকারও সন্ধান পাওয়া গেল।

সবগুলিই সমুদ্রের বুকে, ব্যতিক্রম হলো আফগানিস্থানের পশ্চিম দিকের একটি অঞ্চল। সবগুলি এলাকা ত্রিকোণ নয়, কোনোটি গোলাকার, কোনোটি আবার লজেন্সের মতো আকৃতি, ত্রিকোণও আছে কিংবা ডায়মণ্ডের মতো আকৃতি।

উক্ত দশটি স্থানের অবস্থানও বেশ কৌতূহলপ্রদ। ইকোয়েটরের উত্তরে আছে পাঁচটি এবং দক্ষিণে পাঁচটি এবং আশ্চর্যের বিষয় প্রতিটি ক্ষেত্রের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে ৭২ ডিগ্রি অর্থাৎ তারা পরস্পর থেকে সমান দূরে অবস্থিত।

ঐ দশটি ক্ষেত্র ব্যতীত উত্তর মেরুতে একটি এবং দক্ষিণ মেরুতে একটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছে।

পৃথিবীতে আজকাল নানাস্থানে ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত চাকী এবং সনাক্ত করা যায় না এমন সব যান যাদের বলা হয় ইউ এফ ও অর্থাৎ আন-আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট দেখা যায় যাদের আনাগোনা নাকি ঐ দশটি এলাকায় লক্ষ্য করা গেছে।

এই এলাকাগুলির সমুদ্র অশান্ত, প্রায়ই ঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায় এবং এখানে জাহাজ বা বিমান অদৃশ্যের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

উক্ত সোসাইটি, জাপানের সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি এজেন্সি এবং আরও কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান বা বিজ্ঞানী রহস্য সমাধানের চেষ্টায় আছেন। তাঁরা মাঝে মাঝে বই ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে জানিয়ে দেন তাঁরা কতখানি অগ্রসর হলেন বা কি বাধা ও রহস্যের সম্মুখীন হচ্ছেন।

৯

সমুদ্রের অতল জলের গহনে বিরাটাকায় সরীসৃপ বা কোনো জন্তু বা অজানা কোনো সভ্যতার অস্তিত্ব কি আছে?

অতল জলের আহ্বান

স্করপিয়ন-এস এস ২৭৮ একটি মার্কিনী সাবমেরিনের নাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী জাহাজগুলির ভীতির কারণ হয়েছিল, ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।

স্করপিয়নের নাম শুনলে জাপানী নাবিকদের বুক দুর দুর করত।

স্করপিয়ন অর্থাৎ কাঁকড়া বিছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলের কাঁকড়া-বিছেগুলি বেশ বড় বড় হয়, পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। সেই কাঁকড়া-বিছে যখন তার হুল উঁচু করে তেড়ে আসে তখন তার চেহারা দেখলেই ভয় হয় এবং হুল ফুটিয়ে দিলে তো মৃত্যু পর্যন্ত হয়।

সেই কাঁকড়া-বিছে কল্পনা করেই বোধহয় ঐ ডুবোজাহাজের নামকরণ করা হয়েছিল।

স্করপিয়ন নামে একরকম মাছও আছে। কই মাছের মতো তার ধারালো পাখ্না দিয়ে মানুষকেও জখম করতে পারে। অর্থাৎ যারা স্করপিয়ন নামকরণ করেছিল তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে এই সাবমেরিন কাঁকড়াবিছে বা ঐ নামের মাছের মতোই বিপজ্জনক।

কাঁকড়া-বিছের ও স্করপিয়ন মাছের দুর্নাম 'স্করপিয়ন-২৭৮' সাবমেরিনও অর্জন করেছিল তবে শত্রুমহলে। অনেক জাহাজ সে ঘায়েল করেছিল তারপর ডেভিলস সি তাকে একদিন গ্রাস করল। তার কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির তিনখানা বিচ্ছু যুদ্ধজাহাজ (পকেট ব্যাটলশিপ) শার্নহর্স্ট, বিসমার্ক আর গ্র্যাফ স্পি ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল তেমনি ঘোল খাইয়েছিল জাপানী নৌবাহিনীকে এই স্করপিয়ন।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের পোর্টসমাথ নেভি ইয়ার্ডে আমেরিকানরা এই সাবমেরিনটা তৈরি করেছিল। ১৯৪২ সালে ২০ জুলাই তারিখে পোর্টসমাথ নেভি ইয়ার্ডের মাস্টার মোল্ডারের কন্যা মিস মোল্ডার সাবমেরিনটিকে জলে 'ভাসান'।

ঐ বছরেই পয়লা অক্টোবর তারিখ থেকে সাবমেরিনকে ডিউটি দেওয়া হয়। ১৯৪৩ সালের মাচ মাসে তাকে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকানদের বিরাট নৌঘাঁটি পার্লহারবরে আনা হয়।

পার্লহারবর থেকেই স্করপিয়নের বিজয় অভিযান শুরু হয়। স্করপিয়ন যেমন দ্রুত গিয়ে কোনো জাহাজকে আক্রমণ করতে পারত তেমনি দ্রুত পালিয়ে আসতেও পারত। এইটে ছিল ওর মস্ত গুণ।

রক্ষী জাহাজ পরিব্যাপ্ত হয়ে জাপানী মালবাহী বড় বড় জাহাজ যাচ্ছে। তাদের পাহারা দিচ্ছে ব্যাটলশিপ ডেস্ট্রয়ার ইত্যাদি। তাদের ব্যূহ ভেদ করে দ্রুত এগিয়ে স্করপিয়ন টরপেডো ছেড়ে জাহাজকে ঘায়েল করে চক্ষের নিমেষে পালিয়ে যেত।

শত্রুপক্ষের জাহাজ থেকে ডেপথচার্জ নিক্ষেপ করে স্করপিয়নকে ঘায়েল করতে পারত না। জাহাজ থেকে জলের ভেতরে কামান থেকে গোলা বা ডেপথচার্জ নিক্ষেপ করা

হতো। জলের ভেতর তুমুল আলোড়ন হতো। সেই আলোড়নের ফলে ডুবো জাহাজ ওলটপালট খেয়ে ডুবে যেত, ভেসে উঠত কিন্তু এই ভাবে স্করপিয়নকে ঘায়েল করা যায় নি।

ডেপথচার্জ ফাটবার আগে হয় সে দূরে পালিয়ে যেত কিংবা গভীর সমুদ্রে নেমে যেত যেখানে ডেপথ চার্জের কোনো প্রতিক্রিয়া হতো না। ৮ মে ১৯৪৩ তারিখে স্করপিয়ন তার প্রথম অভিযান শেষ করে নিরাপদে পার্লহারবার ঘাঁটিতে ফিরে এলো। বিশ্রাম এবং ওভারহলিং। তিন সপ্তাহ পরে হুল শানিয়ে নিয়ে স্করপিয়ন আবার দূর সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ল। পরে মিডওয়ে দ্বীপের ঘাঁটিতে তেল ভরে নিয়ে সে পূর্ব দিকে চলল। তার লক্ষ্য জাপানী জাহাজের আনাগোনার করমোজা-সুশিমা-নাগাসাকি পথ।

পথের ধারে ঘাপটি মেরে ডুবে রইল। মাঝে মাঝে ভেসে উঠে পেরিসকোপ দিয়ে দেখে জাহাজ আসে কি না।

৩রা জুলাই তারিখে সকালে দেখল পাঁচটা মালবাহী জাহাজ আসছে, তাদের পাহারা দিয়ে আনছে কয়েকটা ডেস্ট্রয়ার।

রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টরপেডো ছাড়ল। একেবারে ডাইরেক্ট হিট। দু'খানা জাহাজ ডুবল, আজান মারু এবং কোকুরিউ মারু।

ডেস্ট্রয়াররা কিছু করবার আগে স্করপিয়ন তাদের পাল্লার বাইরে পিটটান দিয়েছে। ডেস্ট্রয়ারগুলো ছাড়ল না। তারা বিভিন্ন দিকে তাড়া করল। ডুবোজাহাজের পেরিস্কোপ দেখতে পেলেই ডেপথচার্জ ছাড়বে। ডেস্ট্রয়ারগুলোর স্পিড বড় কম নয়।

স্করপিয়ন বিপদ গনল। সে সমুদ্রের গভীরে চলে গেল একেবারে তলদেশে পৌঁছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ডেস্ট্রয়ার থেকে সাতটা ভারি ওজনের ডেপথচার্জ ছাড়া হলো।

স্করপিয়নের মাথার ওপর জলে তীব্র আলোড়ন। সেই আলোড়ন নিচে পৌঁছল। ডুবোজাহাজখানা দুলে দুলে উঠতে লাগল। ভাগ্য ভালো ডেপথচার্জগুলো কিছু দূরে ফেটেছিল।

স্করপিয়ন একটু দূরে সরে গেল। জাপানীরা তখন ওপরে জাহাজ থেকে সাবমেরিন ধরা চেন নামিয়ে দিচ্ছিল। সেই চেন সাবমেরিনের কোনো অংশ জড়িয়ে ধরে ফেলতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ডেপথচার্জ বিস্ফোরিত হলো।

জাপানীরা বেপরোয়া। ডুবোজাহাজখানাকে ঘায়েল করতে হবে। কিন্তু এ যাত্রায় পারা গেল না। তবুও তারা বিরত হয় নি। আবার চেন নামিয়েছিল, আবার ডেপথচার্জ বিস্ফোরণ।

গভীর জলে ডুবে স্করপিয়ন কোনো রকমে পালিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত জাপানী ফাঁদ কাটিয়ে বেরিয়ে এলো।

স্করপিয়নের বিশেষ ক্ষতি হয় নি তবে শব্দ-প্রেরক যন্ত্রটা জখম হয়েছিল যে জন্যে সে তিন দিন কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। ১৫ জুলাই স্করপিয়ন মিডওয়ে ঘাঁটিতে এলো। সেখানে কিছু মেরামতী কাজ করিয়ে অগস্টের মাঝামাঝি পার্ল হারবরে ফিরে এলো। বাকি মেরামত কাজ এখানেই করা হবে।

সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ স্করপিয়নকে দুটি ব্যাটল স্টার দেওয়া হলো। পরে আরও একটা ব্যাটল স্টার পেয়েছিল কিন্তু সেই তার শেষ।

১৩ অক্টোবর তারিখে পার্লহারবার থেকে স্করপিয়ন আবাব যাত্রা শুরু করল। এবার সে ঘুরে বেড়াবে ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জকে ঘিরে।

একেই তো অপয়া ১৩ তারিখে যাত্রা শুরু করল তারপর তাকে যেতে হবে জাপানে 'বারমুডা ট্র্যাঙ্গল' ডেভিলস সি-এর ভেতর দিয়ে।

নভেম্বরের গোড়ার দিকে একটা জাপানী জাহাজকে তাড়া করল। জাহাজখানার স্পিড খুব, যদিও বা ধরতে পারত কিন্তু হঠাৎ প্রবল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি পড়ছে, পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে ভালো দেখা যাচ্ছে না, কোন্ দিক দিয়ে কোথায় জাহাজখানা চলে গেল বোঝা গেল না।

কিন্তু তিন দিন পরে ৮ নভেম্বর তারিখে সামনে অনেকগুলো শিকার। এধারে জাপানী জাহাজ আনাগোনার একটা পথ আছে, ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ থেকে গুপাজা-রস দ্বীপ পর্যন্ত।

কনভয়ের ভেতরে একটা মালবাহী আর একটা তেলবাহী জাহাজকে ঘায়েল করে পালাল সাইপান দ্বীপের দিকে। সেখানে দেখতে পেল জাপানী সৈন্য বোঝাই বিরাট একটা জাহাজ চলেছে। তাকে পাহারা দিচ্ছে দুখানা ডেস্ট্রয়ার আর একটা করভেট। সৈন্যবাহী জাহাজখানা তো ডোবানো দরকার কিন্তু খুব সাবধানে যেতে হবে। সঙ্গে কড়া পাহারা রয়েছে। তাড়া করল কিন্তু তার রাডার খারাপ হয়ে গেল। আপাতত রণে ভঙ্গ দিতে হলো।

পরে তার পেরিস্কোপে জাহাজখানা আবার দেখতে পেল। জাহাজটা বেশ জোরে চলছে, কিছুতেই ধরতে পারছে না। পাল্লার মধ্যে পৌঁছতে পারা চাই তো নইলে টরপেডো ছাড়বে কি করে? তবুও মধ্য রাত্রি পর্যন্ত জাহাজের পিছনে ছুটল। তার-পর রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

ব্যর্থকাম হয়ে পার্ল হারবরে ফিরে আসতে হলো। ১৩ তারিখে বেরোলেও কোনো

দুর্ঘটনা ঘটে নি।

২৯ ডিসেম্বর তারিখে আবার যাত্রা করল। কমাণ্ডার হলেন এম জি শিমিড। কমাণ্ডার হিসেবে দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং সুনামের অধিকারী।

যাত্রা করার পর পঞ্চম দিনে সে শয়তানের সাগরে প্রবেশ করেছে। তখনও শয়তান সাগর তার দুর্নাম অর্জন করে নি।

ঘাঁটিতে রেডিওবার্তা পাঠাল যে ডুবোজাহাজের ভেতরে একজনের হাত ভেঙে গেছে। তাকে কোনো জাহাজে তুলে দিয়ে হাসপাতালে পাঠান দরকার।

কাছাকাছি সমুদ্রে 'হেরিং' জাহাজখানা টহল দিচ্ছে। সে যদি যোগাযোগ করে তো আহত লোকটাকে জাহাজে তুলে দেওয়া যায়। কিন্তু সমুদ্র তখন অশান্ত। লোকটাকে ডুবোজাহাজ থেকে জাহাজে তোলা গেল না।

সেদিন মধ্যরাত্রে ঘাঁটিতে স্করপিয়ন একটা সংক্ষিপ্ত রেডিও মেসেজ পাঠাল; "আণ্ডার কণ্ট্রোল।"

জঙ্গী ডুবোজাহাজের সেই শেষ বার্তা। তার কাছ থেকে পরে আর কিছু শোনা তো যায়ই নি, আর তাকে দেখাও যায় নি, কোনো ঘাঁটিতে সে আর কোনোদিন ফিরে আসে নি।

২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যেও তার উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠিয়ে কোনো জবাব পাওয়া গেল না তখন মার্কিন নৌবাহিনী সরকারী ভাবে জানিয়ে দিলো স্করপিয়ন 'লস্ট ইন অ্যাকশন'। জাপানী জাহাজের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে স্করপিয়ন সলিল সমাধি লাভ করেছে।

কিন্তু তাই কি? কোনো জাপানী জাহাজের সঙ্গে তার তো যুদ্ধ হয় নি। তাহলে তো জাপানীরাই সগর্বে তা ঘোষণা করত।

যুদ্ধের পর জাপানী খাতাপত্তর উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু ঐ সময়ে কোনো জাপানী জাহাজ কোনো আমেরিকান ডুবোজাহাজের মুখোমুখি হয় নি। সামান্যতম সূত্রও পাওয়া যায় নি।

জাহাজখানা জাপানীরা ডোবায় নি, তাহলে কি কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছিল? রেডিও বার্তাও পাওয়া যায় নি।

জাহাজে ছিল ছ'জন অফিসার এবং চুয়ান্নজন ক্রু। এই লোকগুলি সমেত স্করপিয়ন শয়তান সমুদ্রের কাছে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। কোথায় আশ্রয় নিয়েছে? অনুসন্ধান করা হয়েছিল কিন্তু···রহস্যজনক ভাবেই সে দুর্ধর্ষ জাহাজখানা কোথায় হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেলেও আমেরিকানরা স্করপিয়নকে ভোলে নি। সামরিক ইতিহাসের পাতায়

তার ও আরোহীদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। যুদ্ধের পর মার্কিনরা আরও একটা 'স্করপিয়ন' তৈরি করল।

কনেকটিকাট স্টেটের গ্রোটন-এর জেনারেল ডাইনামিকস করপোরেশনের ইলেকট্রিক বোট কোম্পানি ডিভিসনের তত্ত্বাবধানে এই নতুন স্করপিয়ন তৈরি হলো।

এটি কিন্তু দ্বিতীয় স্করপিয়ন নয়। এটি ষষ্ঠ, নাম স্করপিয়ন-এস এস (এন) ৫৮৯। হারিয়ে যাওয়া স্করপিয়ন-এস এস ২৭৮-এর কমাণ্ডার ম্যাক্সিমিলিয়ান জি শিমিড-এর কন্যা মিসেস এলিজাবেথ বি মরিসন ১৯ ডিসেম্বর ১৯৫৯ তারিখে সাড়ম্বরে এই নবতম সাবমেরিনটিকে জলে ভাসালেন।

নতুন স্করপিয়ন তেলে চলবে না, চলবে পারমাণবিক শক্তি দ্বারা। নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটর সাবমেরিনের ভেতরেই বসানো আছে। এই ধরনের পারমাণবিক শক্তি চালিত বা নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিনগুলিকে স্নেপজ্যাক ক্লাসের সাবমেরিন বলা হয়।

সাবমেরিনটি ২৫১ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা। অফিসার ও ক্রু মিলিয়ে একশ'জন লোক বহন করবার ব্যবস্থা আছে। সাবমেরিনটি থেকে একসঙ্গে ৬টি টরপেডো ছাড়বার ব্যবস্থা ছিল।

সাবমেরিনের পক্ষে উপযুক্ত নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতি নতুন স্করপিয়নে বসানো ছিল তবে সাবমেরিনটি এমনভাবে তৈরি যে বেশি গভীরে এটি নামতে পারত না। এর আগে 'থ্রেশার' নামে নিউক্লিয়ার পাওয়ারড একটি সাবমেরিন নিমজ্জিত হওয়ার ফলে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যে স্করপিয়ন যেন একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ডুবতে পারে।

১৯৬০ সালের ২৯ জুলাই তারিখে ডিউটির জন্যে স্করপিয়নকে ছাড়া হলো। কমাণ্ডারের নাম নরম্যান বি বেস্তাক। আটলান্টিক ফ্লিটের ৬২ নম্বর সাবমেরিন ডিভিসনের ছ'নম্বর স্কোয়াড্রন অন্তর্ভুক্ত করা হয় ডুবো-জাহাজটিকে।

নতুন সাবমেরিনের ক্রিয়াকলাপ অসাধারণ। মহড়া ও প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে সে অনেক পুরস্কার লাভ করল। বারমুডা, ফ্লোরিডা এবং পুয়েরটো রিকো অঞ্চলে মহড়ার সময় আক্রমণকারী বা আত্মরক্ষাকারী, উভয় রকম কৌশলে সে অপরাজেয়। দুটি বিশেষ বিভাগে স্করপিয়ন কৃতিত্ব দেখিয়ে নৌবিভাগের স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করল।

মার্কিন নৌবহরে সকলের মুখে মুখে স্করপিয়নের নাম ঘুরতে লাগল। একটি সাবমেরিন তৈরি হয়েছে বটে, এর আর জোড়া নেই।

ইতিমধ্যে স্করপিয়নের পরিচালনা ভার দেওয়া হয়েছে কমাণ্ডার জেমস আর লিউইস-

এর ওপর। উত্তর আটলান্টিক এবং ক্যারিবিয়ান সাগর অঞ্চলে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি নৌবিভাগের কমেনডেশন মেডেল অর্জন করলেন। সাবমেরিনের অন্যান্য ব্যক্তিদেরও পুরস্কৃত করা হলো।

জয়ের পর জয়। ব্যাটল এফিসিয়েন্সি প্রতিযোগিতায় স্করপিয়ন পর পর দু'বার জয়ী হলো।

১৯৫৮ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি তারিখে ভার্জিনিয়া স্টেটের নরফোক নেভাল শিপ-ইয়ার্ডে স্করপিয়নকে আনা হলো। আগাগোড়া চেকআপ করা হলো। প্রয়োজনীয় মেরামত বা যন্ত্রাংশ বদল করা হলো এবং নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর রিফুয়েল করা হলো যাতে আবার বেশ কয়েক বছর চলতে পারে। কারণ এবার দীর্ঘদিনের জন্যে তাকে নতুন ডিউটিতে পাঠান হবে।

তার আগে নাবিকদের নতুন করে আর একবার ট্রেনিং দেওয়া হলো। এরকম মাঝে মাঝে করা হয়। তারপর আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রগুলি পরীক্ষার জন্যে পুয়েরটো রিকো এবং ভারজিন আইল্যাণ্ডে কিছুদিন কাটাতে হলো।

কমাণ্ডার লিউইস অবসর গ্রহণ করলেন বা অন্যত্র বদলি হলেন, তাঁর জায়গায় নতুন কমাণ্ডার এলেন ফ্রান্সিস এ স্লেটারি। ১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে স্করপিয়নের ট্রেনিং বা পরীক্ষা শেষ হলো।

ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখে স্করপিয়নকে পাঠান হলো ভূমধ্যসাগরে, দীর্ঘ দিন ধরে সিক্থ ফ্লিটের সঙ্গে তাকে ডিউটি দিতে হবে। আটলান্টিক অতিক্রম করে মেডিটারি-নিয়ানে যাবার পথে স্পেনের রোটা ঘাঁটিতে মার্চের গোড়ায় পৌছল এবং ইটালির ট্যারাণ্টো ঘাঁটিতে পৌছল ১০ মার্চ। তারপর চলল কঠোর ডিউটি।

মে মাসে আমেরিকায় নরফোকে মূল ঘাঁটিতে ফিরে যাবার আদেশ হলো। অফিসার ও নাবিকেরা মেজাজে আছে। দেশে ফিরে ছুটি নিয়ে বাড়ি যাওয়া যাবে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হবে। কয়েকটা দিন আনন্দে কাটানো যাবে।

ফেরার পথে অ্যাজোরস অঞ্চল থেকে তার নিজস্ব ঘাঁটিতে স্করপিয়ন রেডিওবার্তা পাঠাল: "সব ভালো সবাই ভালো। আর এক সপ্তাহের মধ্যে পৌছে যাচ্ছি।"

নিউক্লিয়ার শক্তি পরিচালিত সাবমেরিনের সেই হলো শেষ বার্তা। এরপর সব চুপ-চাপ। ওদিকে স্করপিয়নকে গ্রহণ করবার জন্য নরফোক বেস প্রস্তুত।

কিন্তু আর একটিও বার্তা পাওয়া গেল না। ভালো বা মন্দ কিছুই নয়। ওদিকে সাতদিন পার হয়ে গেল। স্করপিয়নের কোনো খবর নেই। নরফোক বেস তথা ইউ এস নেভি উদ্বিগ্ন তবুও আর দুটো দিন অপেক্ষা করে দেখা যাক।

ইউ এস নেভি একটা বুলেটিন প্রচার করলেন: 'স্করপিয়ন ওয়াজ ওভার ডিউ'।

স্করপিয়নের ফেরার তারিখ পার হয়ে গেছে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য নরফোক বেসের রেডিও অপারেটর বার বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। কোনো সাড়া নেই। সাবমেরিনের তো কোথাও দেখা নেই।

সাতদিন তো পার হয়ে গেছেই এরপর আরও ন'দিন পার হলো। বেশ বোঝা গেল স্করপিয়ন আর ফিরবে না। নিরানব্বুইজন দক্ষ অফিসার ও নাবিকসমেত তার সলিল সমাধি ঘটেছে।

সরকারিভাবে ঘোষণা করা হলো : স্করপিয়নকে আমরা হারিয়েছি। কিন্তু কি ভাবে হারালুম? কিভাবে তার সলিল সমাধি ঘটল। আপৎকালীন সব রকম ব্যবস্থাই তো নেওয়া হয়েছিল তবুও এরকম কি করে হয়? সামান্য একটা বার্তাও সে পাঠাতে পারল না।

এর অনুসন্ধান হওয়া দরকার। নরফোক নৌঘাঁটি, নেভি বোর্ড অফ ইনকুয়ারির মাধ্যমে অনুসন্ধান আরম্ভ করল। কিন্তু সমস্যা হলো কোথায় আরম্ভ করবে? বিশাল সমুদ্রে সে যে ক্ষীণতম সূত্রও রেখে যায় নি। কোথায় আরম্ভ করবে?

জলের তলায় নানাভাবে খোঁজ চলল। আধুনিক যুগে গবেষণার ফলে নানারকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে যার মধ্যে টেলিভিসন অন্যতম। জলের তলার ছবি তোলার উপযোগী টি ভি ক্যামেরা নিয়ে অনেক সাবমেরিন অ্যাজোরস থেকে নরফোকের মধ্যে ছবি তুলে বেড়াতে লাগল।

এই রাস্তা দিয়েই তো স্করপিয়নের নরফোক ঘাঁটিতে ফেরবার কথা। এই বিশাল সমুদ্রের কোন অতল তলে সে লুকিয়ে আছে। এর চেয়ে অন্ধকার ঘরে একটা সোনা-মুখি ছুঁচ খুঁজে বার করা অনেক সোজা। দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের ফলে স্করপিয়নকে পাওয়া গেল। মার্কিন নৌবাহিনীরই "মিজার" নামে একটি রিসার্চ শিপ তাকে আবিষ্কার করল, আজোরস থেকে ৫০০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে দশ হাজার ফুট গভীরে সে মরে পড়ে রয়েছে। লিম্বো অফ দি লস্ট এলাকার ধার ঘেঁষে।

অমন মজবুত একটা সাবমেরিন কি করে ডুবে গেল?

কোনো সদুত্তর নেই। সম্ভাব্য কারণ, সাবমেরিনটি যদি কোনো সামুদ্রিক পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থাকে কিংবা তার নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ ঘটে থাকে? সাবমেরিনের ভেতরে জল ঢুকে যেতে পারে, অন্য কোনো সাবমেরিন বা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা এবং সাবোটাজ। নিমজ্জিত সাবমেরিনের ও আশপাশ এলাকার কম করে সাড়ে বারো হাজার ফটো তোলা হয়েছিল এবং বোর্ড অফ ইনকুয়ারি সেগুলি পরীক্ষা করেছিল। ওপরে যে সম্ভাব্য কারণগুলি দেওয়া হলো তার কোনোটিই ডুবে যাওয়ার কারণ নয়।

ঐ অঞ্চলেই কোনো সামুদ্রিক পাহাড় ছিল না, বিস্ফোরণ ঘটে নি কারণ স্করপিয়ন অক্ষত ছিল। হঠাৎ জল ঢুকে যাওয়ার কোনো রকম পথ ছিল না তবুও জল ঢুকে গেলে সে জলের মোকাবিলা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। অন্য কোনো সাবমেরিন বা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে সে তো খবর আগেই জানা যেত।

স্যাবোটাজ? যদি কোনো নৌঘাঁটিতে সিকিউরিটি গার্ডের চোখে ধুলো দিয়ে শত্রু-পক্ষের কোনো এজেন্ট সাবমেরিনে ঢুকে কোনো যন্ত্র বিকল করে দিয়ে থাকে তাহলে দুর্ঘটনা অনেক আগেই ঘটত। আর সাবমেরিনের ভেতরে যদি কেউ স্যাবোটাজ করে থাকে তাহলে সেও অন্যান্যদের সঙ্গে মরেছে।

কিন্তু যেসব নাবিককে স্করপিয়নে ডিউটি দেওয়া হয়েছিল তাদের জীবনপঞ্জী বার বার পরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের নাড়ীনক্ষত্রের খবর নেওয়া হয়েছে। এমন বর্ণচোরা কেউ থাকতে পারে না।

আজও কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তাহলে কি সমুদ্রের নিচে কিছু আছে? কিংবা ওপরে?

কেউ কেউ অনুমান করে যে অন্য গ্রহ থেকে দেবতারা একসময়ে পৃথিবীতে আসত। তারা কি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল, ডেভিলস সি সমেত বাকি আটটি রহস্যময় অঞ্চলে এমন কিছু করে গেছে যার ফলে আজও তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে?

প্রাচীনকালের প্রাচীন সভ্যতার অনেক কাহিনী শোনা যায়। কিছু কিছু নিদর্শন আজও দেখা যায়। কোনার্ক মন্দিরের ভেতরে একটি গোলাকার চুম্বক শূন্যে অবস্থান করত। সেটিকে এমনভাবে রক্ষা করা হয়েছিল যে কোনো অবলম্বনের প্রয়োজন হয় নি।

মিশরের পিরামিড তো আজও বিস্ময় এবং সেটা কি ভাবে তৈরি করা সম্ভব হলো সেও এক বিস্ময়।

উত্তর মেরুতে বরফের রাজ্যে নাকি সভ্য মানুষের রাজ্য আছে। তারা নাকি আমাদের চেয়েও উন্নত।

এইগুলির অদৃশ্য হাত কি পৃথিবীতে এইসব অলৌকিক বা রহস্যময় ঘটনা ঘটাচ্ছে। তারাই কি দায়ী? নাকি গ্রহান্তরের জীব?

ইল মাছেরা যায় কোথায়? ইল বা ইলেকট্রিক ইল মাছের খবর আপনারা জানেন। এই মাছ নাকি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। জলের ভেতরেই এদের গায়ে মাঝে মাঝে আলো জলে ওঠে।

সেই ইল মাছেরা ডিম পাড়তে যায় বারমুডা দ্বীপে। কোথা থেকে যায়? একদল যায় ইউরোপ থেকে আর একদল যায় আমেরিকা থেকে।

ইউরোপ থেকে যারা যায় বারমুডা পৌঁছতে তাদের সময় লাগে তিন বছর। যাই হোক বারমুডায় ইল মাছেরা বাচ্চা পাড়ে, সেই বাচ্চা বড় হয়ে যে যার দেশে ফিরে আসে কিন্তু ধাড়ী মাছেরা ফেরে না! তারা যে কোথায় যায় তা অনেক চেষ্টা করেও বিজ্ঞানীরা আজও জানতে পারে নি। বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের এ-ও এক রহস্য।

১০

একজন অতীন্দ্রিয়বাদী বলেন: ওরা সব আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু আমার সঙ্গে ওদের কথা হয়···

ওদের কি হলো?

সারা পৃথিবীতে সকলেই প্রশ্ন করছে যে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল থেকে যারা হারিয়ে গেল তারা গেল কোথায়? তারা সবাই ইহলোক ত্যাগ করে অন্য কোনো লোকে বাহাল তবিয়তে অবস্থান করছে নাকি সবাই খতম হয়ে গেছে।

খতম যদি হয়েই থাকে তাহলে পৃথিবীর কোথায়, কোন্ প্রান্তে, কোন্ দেশে তারা কিভাবে খতম হলো? তাদের মৃতদেহ গেল কোথায়?

মুশকিল হলো কি কোনো প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই অনুমান করছে, এই হয়েছে, তাই হয়েছে, অমুক হতে পারে, কিন্তু হলোটা কি তা কি কেউ সঠিক-ভাবে বা প্রমাণসমেত বলতে পারছে? কিন্তু বুদ্ধিতে যখন ব্যাখ্যা করা চলে না তখন অন্য কিছু দ্বারা কিছু একটা উত্তর পাওয়া যায়।

আমেরিকার কনেকটিকট স্টেটে একজন খ্যাতনামা অতীন্দ্রিয়বাদী আছেন, নাম এড য়েডেকার। তিনি বলেন তোমরা মিছেমিছি মাথা ঘামাচ্ছ কিন্তু আমি জানি ওরা সবাই আছে। আমার আর একটা চোখ আছে, "তৃতীয় নয়ন", আমি সেই চোখ দিয়ে দেখতে পাই। তারা যেখানে আছে আমি জানি, কারও কারও সঙ্গে আমার কথা হয়।

য়েডেকার বলেন যে আমাদের বায়ুমণ্ডলে অনেক টানেল বা ফানেল আছে। মানুষের চোখে সেগুলি অদৃশ্য কিন্তু সেগুলি আছে। সকলে দেখতে পায় না, আমরা দেখতে পাই। তিনি বলেন:

—আমি সেগুলি দেখতে পাই, আমাদের হারিয়ে যাওয়া জাহাজ, বিমান মানুষ সব ঐগুলির ভেতরে আছে। দেখতে কেমন? টর্নাডো ঝড় যখন ধেয়ে আসে তখন

তাকে দেখে মনে হয় লম্বা ও সরু একটা 'ফানেল' বুঝি ছুটে আসছে, ঠিক সেই রকম ঐ সব ফানেলের আকার।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলে যে বা যারা নিরুদিষ্ট হয়েছে তাদের ঐ ফানেল টেনে তুলে নিয়েছে। এই ফানেলগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আসে আর সেই সময় তাদের ফানেলের মধ্যে টেনে তুলে নিয়ে একজায়গায় জমা করে রাখে। ফানেলের ভেতর ঠিক জমা করে রাখে না তবে মেরু প্রদেশের কোথাও বা আরও দূরে তাদের কোনো গুপ্ত আস্তানায় জমা করে রাখছে।

স্মেডেকার তাদের কাউকে কাউকে দেখেছেন, কারও সঙ্গে কথাও বলেছেন বলে দাবি করেন।

এইসব হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে এই পৃথিবীতে আর দেখা যাবে না কিন্তু তারা আছে, স্মেডেকার বলেন, তাদের কথা শোনা যায়।

—একজনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, স্মেডেকার বলেন, সে ব্রিটিশ রয়েল এয়ারফোর্সের একজন পাইলট। ১৯৪৫ সালে সে হারিয়ে যায়। তখন তার বয়স ছিল ৫০ বছর। আমি তার খোঁজ করতে থাকি। খোঁজ করতে করতে ১৯৬৯ সালে সন্ধান পাই তবে মেরুপ্রদেশে নয়, পৃথিবার অভ্যন্তরে একটা ফাঁকা স্থানে। ঐ পাইলটের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। স্মেডেকারের মতো আর একজন আছে। ইনি হলেন একজন তিব্বতী লামা, নাম লোবসাং রামপা। রহস্যলোক বারমুডা ট্র্যাঙ্গল সম্বন্ধে তিনিও কিছু বলেছেন।

তিনি বলেন হারিয়ে যাওয়া এই সব জাহাজ, বিমান, মানুষ চলে গেছে এই পৃথিবী থেকে আর এক পৃথিবীতে।

রামপা বলেন যে এই অসীম বিশ্বে আমাদের সৌরজগতের অনুরূপ আর একটা সৌরজগৎ আছে। ঠিক একই রকম, আমাদের মতোই। আমাদের পৃথিবী থেকে কোনো কিছু আকর্ষণ করবার ক্ষমতা সেই সৌরজগতের আছে।

তিনি বলেন: ঠিক কি করে সেটা সম্ভব হচ্ছে তা আমরা সঠিকভাবে জানি না তবে গবেষণা চলছে এবং শীগগিরই জানতে পারব বলে আশা রাখি। একটা কিছু নিশ্চয় আছে তার আভাস আমরা অনেকবার পেয়েছি কিন্তু সেটার রূপ কি তা শীগ্‌গির জানাতে পারব বলে মনে করি।

তবে এই ত্রিকোণ রহস্য সমাধানের জন্যে নানাদিক থেকে যেসব গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তা ক্রমশ একটা উপসংহারের মুখে এসে যাচ্ছে। রহস্যটা যে ঝড়-তুফান বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সীমাবদ্ধ নয় সেটা জোর করেই এখন বলা যায় কারণ আদর্শ আবহাওয়াতে অনেক জাহাজ বা বিমান নিখোঁজ হয়েছে।

বর্তমানে তো জাহাজ বা বিমানে রেডিও থাকে। নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পূর্বে অনেক বিমান বা জাহাজ বিপদ সংকেত পাঠায় নি। কারণ কি? এমন কি 'স্টার এরিয়াল' নামে সেই বিমানখানা যেখানা ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে বারমুডা থেকে জ্যামাইকা যাচ্ছিল সেই বিমান রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হওয়ার আগে বরঞ্চ জানিয়েছে যে আবহাওয়া চমৎকার, নির্দিষ্ট সময়েই কিংস্টন পৌঁছব আশা করি।

অতএব খারাপ আবহাওয়াই সব সময়ে দায়ী নয়। উত্তাল তরঙ্গ বা সমুদ্রের মধ্যে ভূমিকম্পকেও সব সময়ে দোষ দেওয়া চলে না। সমস্যাটা যেন আমাদের অজানা পরিবেশগত একটা কিছু।

মার্কিন নৌবাহিনীও নাকি মনে করছে যে এইসব রহস্যের আড়ালে একটা কিছু আছে। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে তারা 'প্রজেক্ট ম্যাগনেট' নাম দিয়ে একটা কমিটি গঠন করেছে। তড়িৎ চুম্বক, মহাকর্ষ বা নভোমণ্ডলে কোনো আলোড়ন এই রহস্যের জন্যে কতখানি দায়ী হতে পারে তা ঐ কমিটি অনুসন্ধান করছে।

যেদিন পাঁচখানা অ্যাভেঞ্জার বিমান নিখোঁজ হয়ে গেল, সেদিন ঘটনার সময়ে সমুদ্রের বুকে একখানা জাহাজের ক্যাপটেন নাকি দূর আকাশে একটা অগ্নিপিণ্ড দেখতে পেয়েছিল। এটা কি সম্ভব যে ঐ পাঁচখানা বিমান এবং তাদের উদ্ধারের জন্যে প্রেরিত বিমানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল? সে জন্যে কি নভোমণ্ডলের তড়িৎ চুম্বক দায়ী?

নেভাল রিসার্চ অফিস কয়েক বছর আগে এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্যে বিখ্যাত জিওফিজি সস্ট ডঃ জন ক্যারিস্টু-এর ওপর ভার দিয়েছিলেন।

ডঃ ক্যারিস্টু অনেক অঙ্ক কষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে আমরা যে মহাকর্ষ শক্তির সঙ্গে পরিচিত সেই শক্তি ব্যতীত সমুদ্রে বিভিন্ন প্রকৃতির আর একটা মহাকর্ষ থাকতে পারে। এই মহাকর্ষ শক্তি সমুদ্রের ভেতর বা ওপরে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে।

অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার চুম্বক ক্ষেত্র থাকতে পারে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপও বিভিন্ন রকম হতে পারে। এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে এবং বড় বড় বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন। অনেক গবেষণা-পত্রও প্রকাশিত হয়েছে।

বিজ্ঞানের ছাত্রদের জানা আছে যে কম্পাসের কাঁটা আসল উত্তর দিকে তার কাঁটা নির্দেশ করে না। একটা পার্থক্য আছে। পার্থক্যটাও জানা আছে। দিক-নির্ণয়ের সময়, সেই পার্থক্যের হিসেব করে সঠিক দিক নির্ণয় করতে হয়।

কিন্তু মজা হচ্ছে যে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এবং জাপানের সন্নিকটে ডেভিলস সি অঞ্চলে

কম্পাসের কাঁটা আসল উত্তর দিকই (ট্রু নর্থ) নির্দেশ করে। অথচ এই দুই এলাকাতেই কম্পাস বিকল হয়ে যায়। এই দুই অঞ্চলের চুম্বক ক্ষেত্র কি বিভিন্ন প্রকার? মনে পড়ে কি? সেই পাচখানা অ্যাভেঞ্জার বিমানের ১৯ নম্বর ফ্লাইটের পরিচালক চার্লস টেলর রেডিও কণ্ট্রোলকে বলছিল :

—আমরা কোথায় জানি না, হারিয়ে গেছি মনে হচ্ছে, দিক ঠিক করতে পারছি না···তাছাড়া সব যেন কেমন, আকাশ, সমুদ্র চেনা যাচ্ছে না···

একা টেলরের বিমানের নয়, বাকি চারখানা বিমানও দিকভ্রান্ত হয়ে গেল? তাদেরও কম্পাস বিকল হয়ে গেল? অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

অনুরূপ বিপদে পড়েছিল সেই বৈমানিকটি যে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের ন্যাসো এয়ারপোর্টে অবতরণ করবার আগে কণ্ট্রোল টাওয়ারের কাছে পথের নিশানা চেয়ে বলল : কোথায় নামব বুঝতে পারছি না, সামনে ঘন কুয়াশা, অথচ তখন সেখানে কুয়াশা ছিল না।

দু' একজন গবেষক বলেছেন বায়ুমণ্ডলে তড়িৎ চুম্বকের কোনো ক্রিয়ার ফলে এরকম হতে পারে। এই বিষয়ে গবেষণা চলতে চলতে একদিন হয়তো বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের পুরো রহস্যটাই উদ্ঘাটিত হবে। বিজ্ঞান পত্রিকায় তো এই বিষয়ে বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে।

কয়েক বছর আগে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল প্রসঙ্গে একজন রিপোর্টারের কাছে নৌবাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেছিলেন :

সত্যিই এটা একটা রহস্যকুণ্ড। নৌবিভাগের কেউ এখন এই রহস্যকুণ্ডকে অবজ্ঞার চোখে দেখে না, রীতিমত গুরুত্ব দিচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করে আসছি বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের ভেতরে অদ্ভুত কিছু আছে অথচ তার কোনো যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। সহসা দেখা যায় যে কোনো একটা তরণী যেন ঝাপসা হয়ে গেল, ইলেকট্রনের জাল যেন তাকে ঘিরে ফেলল।

ক্যানাডিয়ান সরকারের নির্দেশে উইলবার বি স্মিথ নামে একজন ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানী ১৯৫০ সালে চুম্বক এবং মহাকর্ষ সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন।

উইলবার স্মিথ একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তিনি বায়ুমণ্ডলে কিছু ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন যার তিনি নাম দেন 'রিডিউসড বাইণ্ডিং' এক একটি রিডিউসড বাইণ্ডিং ক্ষেত্রের ব্যাস হাজার ফুট এবং উচ্চতার শেষ নেই। এগুলি সঞ্চরণশীল তবে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার অন্য অঞ্চলে দেখা যায়।

স্মিথ লক্ষ্য করেন যেখানে বিমানের রহস্যজনক দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে 'রিডিউসড বাইণ্ডিং' ক্ষেত্র দেখা গেছে। তবে মজা আছে। কোনো ডিজাইনের বিমানের ওপর

এই ক্ষেত্রের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। রিডিউসড বাইণ্ডিং ক্ষেত্রের প্রভাবে কম্পাস ও রেডিও বিকল হয়ে যায়, মস্তিষ্কের স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করে, মাথা ঝিমঝিম করে, সকল বুদ্ধি লোপ পায়। আইনস্টাইন বলেন আমরা তিনটে ডাইমেনশনের সঙ্গে পরিচিত, দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ অর্থাৎ হাইট, লেঙ্গথ্ অ্যাণ্ড ব্রেডথ কিন্তু আরও একটা ডাইমেনশন আছে যাকে বলা হচ্ছে চতুর্থ ডাইমেনশন এবং যার নাম হচ্ছে টাইম বা কাল। চলিত কথায় আমরা বলি সময়।

১১

এই আছে এই নেই হাত বাড়ালে পাই না, ছোটবেলার সেই ধাঁধা নাকি ? সত্যিই অবিশ্বাস্য ..

কালের অভিযাত্রী

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল রহস্য সমাধানে অনুসন্ধিৎসু একজন সাংবাদিক মার্কিন বিমান বাহিনীর পাইলটদের প্রশ্ন করে : আকাশে সত্যিই কিছু রহস্য আছে কি ? আকাশে ওড়বার সময় তোমাদের নজরে অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়ে কি ? যেমন রঙিন কুয়াশা, চুম্বকের ঝড়, কোথাও বিশেষ আকৃতির মেঘ বা মেঘের মতো কোনো বস্তু ?

পাইলটরা কিছু বলতে চায় না। কোনো কোনো পাইলট তো বারমুডা ট্র্যাঙ্গল নাম শুনে তর্জনী দিয়ে বুকের ওপর ক্রশ চিহ্ন আঁকে।

একজন বলেছিল একবার খুব উঁচুতে, তিরিশ হাজার ফুটের ওপরে ওড়বার সময় তার মনে হয়েছিল চাঁদ যেন স্থানচ্যুত হয়ে অন্য দিকে সরে যাচ্ছে। আর একজন বলেছিল, মাঝে মাঝে আকাশের রং পালটে যায়, ঘোর নীল থেকে কালো হয়ে যায়, আর মনে হয় সেই ঘোর কালো আকাশের ভেতর টানেল রয়েছে। এই রকম টানেল যখনই দেখেছি তখনি আমার মনে হয়েছে ঐ টানেল বোধহয় আমার প্লেনখানা গ্রাস করবে, তখনই আমি ভয় পেয়ে নিচে এসেছি।

মার্কিন বিমানবাহিনীর কর্তারা কিন্তু পাইলটদের এই সব উক্তি অবিশ্বাস্য বলেন। তাঁরা বলেন পাইলটরা বাহাদুরি নেবার জন্যে এইসব বাজে কথা বলে।

১৯৬১ সালের কথা। ওহিও স্টেটের আকাশের ওপর একজন পাইলট তার বিমান নিয়ে আকাশে উঠেছে।

পরিষ্কার আকাশ। মাঝে মাঝে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে! অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কোথাও কোন গোলমাল নেই।

হঠাৎ সেই পাইলট দেখল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের পুরনো মডেলের একখানা বাই-প্লেন ঠিক তার নিচে উড়ছে, আর একটু ওপরে উঠলেই তাকে ধাক্কা দেবে। প্লেন-খানা সেই আমলের কাঠ ও ক্যাম্বিশের তৈরি। পাইলট তো অবাক। এই রকম পুরনো মডেলের প্লেন এখনও আছে কি না তার জানা নেই। সে তো পরের কথা কিন্তু এই প্লেনখানা একটা অ্যাকসিডেন্ট করবে নাকি। সে তার নিজের প্লেনখানা ওপরে তোলবার চেষ্টা করতেই দেখল পুরনো মডেলের প্লেনখানা আর নেই।

সে কি আকাশে মরীচিকা দেখছে নাকি? নাকি ভৌতিক ব্যাপার? উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে স্পষ্টই একটা ভিন্টেজ প্লেন দেখেছে, কাছে ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে রাখত।

আকাশে থাকতে সেই পাইলট আর সাহস করল না। নিচে নেমে এসে তার অভি-জ্ঞতার কথা বলল। কথাটা সিভিল এরোনটিকস বোর্ডের কানে উঠল। তারা বলল, এটা তো একটা বিরাট ঠাট্টা, ধাপ্পা, হোক্স। পাইলট একটু মজা করতে চেয়েছে। পাইলটের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

পাইলটের জেদ চেপে গেল। সে প্রমাণ করবে সে কিছু ভুল দেখে নি। বিভিন্ন ফ্লাইং ক্লাবে সে খোঁজ করতে লাগল কোথাও পঞ্চাশ বছরের পুরনো মডেলের বাই-প্লেন তখনও চালু আছে কি না।

এমন চালু কোনো বাইপ্লেনের খবরও পাওয়া গেল না তবে একটি শহরের উপকণ্ঠের একজন ডাকপিয়ন বলল যে কোনো একটি ফার্মে সে খুব পুরনো একখানা প্লেন দেখেছে।

ঠিকানাটা জেনে নিয়ে সেই পাইলট তার এক বন্ধুকে নিয়ে গাড়ি নিয়ে তখনি ছুটল। পিয়নের কথা সত্যি। একটা ফার্মের এক অংশে বিরাট একটা রেন ট্রি-এর নিচে পুরনো একটা বাইপ্লেন পড়ে রয়েছে ঠিক যেরকমটি সে দেখেছিল সেই রকম।

এই প্লেনখানাই উড়েছিল নাকি? কিন্তু তা কি করে হয়? দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে যে এই প্লেন অনেকদিন আকাশে ওঠে নি, কেউ হালফিল চালায় নি।

পাইলটের সীটে দেখা গেল সেকেলে হেলমেট ও একজোড়া গগলস রয়েছে। কিন্তু পাইলটের ব্যাগ থেকে লগবুকখানা বার করে সে একেবারে বিস্মিত।

যেদিন সে সেই ভিন্টেজ বাইপ্লেনখানা আকাশে দেখেছিল সেই দিনের তারিখ পেন-সিল দিয়ে লেখা রয়েছে: আকাশে রুপোলি ঝকঝকে একখানা প্লেন দেখলুম।

তারিখটা সেই দিনের কিন্তু আবার একবার ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল যে মাস

ও তারিখ নির্ভুল কিন্তু বছর ? ১৯১১ সাল। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে ! প্রথম মহাযুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয় নি। মানুষ সবে তখন উড়তে শিখছে ?

এও কি সম্ভব ? বিজ্ঞানীরা বলেন সম্ভব। কালের গহ্বরে মানুষ যেমন এগিয়ে যায় তেমনি নাকি আবার পেছিয়েও যায়। আইনস্টাইন তো বলেছিলেন যে পৃথিবীতে মানুষ যত কথা বলেছে সব কথা একদিন আবার শুনিয়ে দেওয়া যেতে পারবে।

বিজ্ঞানীরা কত রকম কথা বলছেন যা আমরা সাধারণ ব্যক্তিরা বুঝতে পারি না, আমাদের কল্পনাও ধারণার অতীত। নভোমণ্ডলে বহুরকম ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র কণিকা আছে, যাদের নানারকম নাম। এরা আগেও ছিল এখনও আছে কিন্তু মানুষের এতদিন জানা ছিল না। এখন সেগুলি আবির্ভূত হচ্ছে। তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও জানা যাচ্ছে। এই সব কণিকার প্রভাবে ও তড়িৎ চুম্বকের সহায়তায় বা অন্যভাবে অনেক কিছু ঘটতে পারে। জীব অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। একই বস্তু একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতে পারে। আমাদের বুদ্ধির অগোচরে আরও কি ঘটতে পারে কে জানে !

জেমস রেমণ্ড উলফ আমেরিকার ক্লার্ক ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক। তাঁর বিষয় প্যারানরমাল ফেনোমেনা, অস্বাভাবিক ঘটনার বিষয় তিনি আলোচনা করেন। তাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

আমেরিকা তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ভারত মনে করে 'সান্টা মেরিয়া' জাহাজে চেপে তটভূমির দিকে এগিয়ে চলেছেন। স্যান স্যালভাডর, যেটিকে তিনি ভারত মনে করেছিলেন সেখানে পৌছতে আর মাত্র চার ঘণ্টা বাকি আছে। ১৪৯২ সালের ১১ অক্টোবর রাত্রি তখন দশটা।

সান্টা মেরিয়া জাহাজের ডেকে চিন্তাকুল কলম্বাস পায়চারি করছেন। এমন সময় তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী দেখলেন সমুদ্রে কে যেন একটা আলোর ক্ষুদ্র শিখা একবার ওপরে তুলছে আবার নামাচ্ছে। মোমবাতিও হতে পারে।

সেখানে সমুদ্র ! তটভূমি আরও ৩৫ মাইল দূরে। সেখানে অতদূরে আদিবাসীদের কোনো নৌকো আসার সম্ভাবনা নেই। সমুদ্র এখানে গভীর। কাছে কোনো জাহাজ থাকারও সম্ভাবনা নেই। আর মাত্র দু'খানি জাহাজ তখন সমুদ্রে ছিল, সে দুখানিও কলম্বাসের।

কোনো জাহাজে ঐ ধরনের আলো দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই কারণ এই আলো দেখে মনে হচ্ছিল যে আলোর সেই শিখা সমুদ্রের তরঙ্গের শীর্ষে ভাসছে।

তাহলে সেই আলো কোথা থেকে এলো ? কলম্বাস ও তাঁর সঙ্গীরা কী আলো দেখলেন ? কে সেখানে আলোর শিখা আন্দোলিত করছে ? এলাকাটা কিন্তু বারমুডা

ট্র্যাঙ্গল !

আপাতত কলম্বাসের কাহিনী মুলতুবি থাক। কলম্বাস ও তাঁর সঙ্গীদের দেখা আলোর শিখায় আমরা পরে আবার ফিরে আসব। আপাতত আমরা ব্রিটিশ সাউথ আমেরিকান এয়ারওয়েজের হারিয়ে যাওয়া বিমান স্টার টাইগার নিয়ে আর একবার আলোচনা করব।

আপনাদের মনে আছে স্টার টাইগার নামে প্লেনটি প্রথম দফায় লণ্ডন থেকে অ্যাজোরস এবং তার পরের দফায় অ্যাজোরস থেকে বারমুডা হয়ে হাভানা যায়।

১৯৪৮ সালের ২৮।৩০ জানুয়ারি রাত্রে প্লেনটি অ্যাজোরস থেকে বারমুডার পথে যায়।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় স্টার টাইগারের পাইলট ক্যাপটেন ডেভিড কোলবি বারমুডায় হ্যামিল্টন কণ্ট্রোল টাওয়ারে বেতারবার্তা পাঠাল যে জোর হাওয়ার জন্যে বিমানের গতি বাড়ানো যাচ্ছে না। হ্যামিল্টনে পৌছতে রাত্রি একটা বাজবে, এখনও প্লেন দেড় ঘণ্টা লেট।

কিন্তু রাত্রি ১টা বেজে গেল। স্টার টাইগার কোথায় ? হ্যামিল্টন কণ্ট্রোল টাওয়ার স্টার টাইগারের সঙ্গে বেতারে সংযোগ করবার চেষ্টা করল। কোনো সাড়া নেই। প্লেনে যথেষ্ট ফুয়েল আছে। রাত্রি ৩-১৫ মিঃ পর্যন্ত সে আকাশে উড়তে পারবে অতএব এখনই ভয়ের কোনো কারণ নেই।

তাছাড়া বিপদ যদি ঘটে, বিমানখানা যদি সমুদ্রে পড়ে তাহলে সে বিমান এমনভাবে তৈরি যে জলে ডুববে না এবং যাত্রীরা রবারের নৌকো বার করে জলে ভাসতে পারবে, প্রাণহানির আশঙ্কা কম।

রবারের নৌকোগুলিতে আপৎকালীন সমস্ত ব্যবস্থা আছে। ওষুধ ও আহার ছাড়া আলোর সিগন্যাল ও বেতার-বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা একটা আছে।

স্টার টাইগার হারিয়ে যাবার পর দু লক্ষ স্কোয়ার মাইল জায়গা জুড়ে অনুসন্ধান চালান হয়েছিল কিন্তু স্টার টাইগার বা তার বত্রিশজন যাত্রীর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। সবাই কোথায় হারিয়ে গেল। পাঁচদিন পরে তেসরা ফেব্রুয়ারি ফ্লোরিডা থেকে সেই নোভাস্কোসিয়া পর্যন্ত উপকূলে রেডিও অ্যামেচারেরা সারারাত্রি ধরে একটা সিগন্যাল শুনেছে স্টা-র-টা-ই-গা-র-স্টা-র-টা-ই-গা-র !

এই সিগন্যাল সম্বন্ধে কিছু অস্বাভাবিকতা ছিল। প্রথা অনুসারে সিগন্যালটি আন্তর্জাতিক মর্স কোডে পাঠান হয় নি তাছাড়া এই সঙ্গে কোনো বিপদ সূচক সংকেত যথা এস-ও-এস পাঠান হয় নি ! ইংরেজি এ অক্ষরটির জন্যে একটি ডট, বি অক্ষরটির জন্যে দুটি ডট, সি অক্ষরটির জন্যে তিনটি ডট, এইভাবে সিগন্যালটি পাঠান হয়েছিল

তাও শুধু প্লেনের নামটি।

বিপদে পতিত অথচ বার্তা প্রেরণে অনভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি আনাড়ীর মতো বার্তাটি পাঠিয়েছিল। স্টার টাইগার বিমানের কোনো জীবিত ব্যক্তি কি সিগন্যালটি পাঠিয়েছিল?

বিমান কোম্পানি বলে যে স্টার টাইগার বিমানখানি অবিলম্বে ডুবে যাবার সম্ভাবনা না থাকলেও পাঁচদিন ধরে সমুদ্রে ভেসে থাকার মতো উপযোগী করে তৈরী নয়। রেডিও বার্তা প্রেরণের যন্ত্র নিমজ্জিত প্রায় বিমান থেকে বার করতে পারলেও রবারের নৌকোয় ভাসিয়ে রাখার পক্ষে ওজনে ভারি।

সবদিক বিবেচনা করে মনে হয় কোথাও কোনো ভাবে রেডিও প্রেরক যন্ত্র সক্রিয় ছিল এবং তা দেশ বা কালের গহ্বরে থাকতে ক্ষতি কি? অসম্ভবও নয়।

স্টার টাইগারের কাহিনীতে আবার পরে ফিরে আসা যাবে ইতিমধ্যে শোনা যাক টেনেসি রাজ্যের গ্যালাটিন গ্রামে গত শতাব্দীর শেষ দিকে কি ঘটেছিল?

তারিখটা হলো ১৮৮০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বিকেলে।

ডেভিড ল্যাং গ্যালাটিন গ্রামের একজন সম্পন্ন চাষী। চল্লিশ একর জমির মালিক। স্ত্রী, এগারো বছরের মেয়ে সারা এবং আট বছরের ছেলে জর্জকে নিয়ে তার পরিবার। সেদিন বিকেলে তার ছেলে ও মেয়ে বাড়ির সামনে খেলা করছে। স্ত্রী বসে বসে সেই খেলা দেখছে। রাঁধুনী ও ভৃত্য বাড়ির ভেতরে।

বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে ডেভিডের দু'জন বন্ধু, বিচারক আগস্ট পেক এবং তার শ্যালক কোথাও যাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে ডেভিডের স্ত্রী ডেভিডকে বলেছিল আস্তাবল থেকে ঘোড়া এনে গাড়ি জুততে। ওদের শহরে যাবার কথা।

যখন ঐ দুই ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই ডেভিড ফাঁকা মাঠ দিয়ে তার ঘোড়া আনতে যাচ্ছিল। আগস্ট পেক, তার শালা, মিসেস ল্যাং এবং সারা ও জর্জ, সকলেই দেখছে ডেভিড ল্যাং ঘোড়া আনতে মাঠ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কি সর্বনাশ! এদের সকলের চোখের সামনে ডেভিড ল্যাং যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল, সে কারও মন্ত্রবলে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল, তাকে আর দেখা গেল না।

মিসেস ল্যাং ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আগস্ট পেক গাড়ি থামাল। তারাও দেখেছিল ডেভিডকে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে।

সেখান থেকে ডেভিড অদৃশ্য হয়েছিল সকলেই সেখানে ছুটে গিয়ে ডেভিডকে খুঁজতে লাগল কিন্তু কোথায় ডেভিড? খবর পেয়ে গ্রামের লোকেরাও দলে দলে ছুটে এলো। রাত্রি পর্যন্ত আলো নিয়ে তারা সর্বত্র খুঁজে বেড়াল কিন্তু ডেভিড ল্যাংকে কোথাও

পাওয়া গেল না।

অবিশ্বাস্য হলেও পাঁচজন লোকের চোখের সামনে একটা মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

এরপর বেশ কিছু দিন কেটে গেল। পরের বছর আগস্ট মাস। ডেভিডের ছেলে মেয়ে একদিন মাঠে খেলতে খেলতে দেখল যে জায়গাটা থেকে তাদের বাবা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সে জায়গাটার ঘাস হলদে হয়ে গেছে এবং ঘাসেরও যেন বাড় নেই। বেশ খানিকটা গোল জায়গা, পনেরো ফুট ব্যাসের একটা বৃত্ত হবে।

ছেলেমানুষ তো। ডেভিডের মেয়ের কি খেয়াল হলো সে হঠাৎ তার বাবাকে ডাকল: বাবা তুমি কি এখানে আছ?

আশ্চর্য। মেয়েটির মনে হলো তার বাবা যেন অনেক দূর থেকে 'হেলপ' বলে সাড়া দিলো।

তারা দু'জন ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে তাদের মাকে গিয়ে বলল, তারা তাদের বাবার গলায় আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

তাদের মা সেই বৃত্তের কাছে ছুটে এসে 'ডেভিড, ডেভিড, আর ইউ এনিহোয়ার অ্যারাউণ্ড?' বলে ডাকতে লাগল।

আশ্চর্য। ডেভিড সাড়া দিলে, 'হেলপ।' তিনদিন ধরে ডেভিডের কণ্ঠস্বর শোনা গেল কিন্তু ঐ একটি কথা, হেলপ। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু কোন দিক থেকে শব্দ আসছে বোঝা যাচ্ছে না।

এ ধরনের ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার ঘটনা আরও কয়েকটি ঘটেছে। লণ্ডনের উপকণ্ঠে একটি মেয়ের আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা যেত। 'গর্তটা কোথায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না' বলে সে কাঁদত। সে কান্না স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিসরাও শুনেছে।

হাল আমলে ১৯৩০ সালে ক্যানাডার উত্তর দিকে মেরু অঞ্চলে একটি গ্রাম থেকে সমস্ত এস্কিমোরা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। না, তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যায় নি তাহলে তো এ ঘটনা বলবারই কোনো দরকার ছিল না।

এস্কিমোরা গ্রাম ছেড়ে কোথাও গেলে তাদের রাইফেল সঙ্গে নেবেই নেবে কিন্তু তারা কেউ রাইফেল সঙ্গে নেয় নি। তাদের 'কায়াক' নামে ক্ষুদ্র নৌকোগুলিও পড়ে ছিল। আহারও সঙ্গে নেয় নি। গ্রামের সমস্ত নরনারী ও শিশু হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এ রহস্যও অজ্ঞাত রয়ে গেল।

বিজ্ঞানীরা বলেন এসব হলো দেশ ও কালের রহস্য। স্টার টাইগার বিমানের জীবিত কোনো ব্যক্তি, ডেভিড ল্যাং বা গ্রামের এস্কিমোরা কালের গহ্বরে পতিত হয়েছে।

স্টার টাইগারের সেই জীবিত ব্যক্তিটি হয়তো রবারের নৌকোয় সমুদ্রের বুকে ভাসছিল এবং রবারের নৌকোয় রক্ষিত স্বয়ংক্রিয় রেডিও প্রেরক যন্ত্র থেকে সিগন্যালটি প্রচারিত হয়েছিল।

তারপর সেই জীবিত ব্যক্তি হয়তো কোনো জাহাজকে তার সিগারেট লাইটার জ্বালিয়ে যখন আলোর সঙ্কেত করছিল সেই সময়ে সে কালের গর্ভে পতিত হয়ে একেবারে সেই কলম্বাসের সময়ে পিছিয়ে যায়। তাকেই মানে তারই আলো হয়তো কলম্বাস দেখেছিল।

বিজ্ঞানীরা আরও বলেন নভোমণ্ডল থেকে বহু রকম অতিসূক্ষ্ম কণিকার বন্যা পৃথিবীকে নিরন্তর আঘাত করছে। কত রকমের কণিকা আছে, কত রকম তাদের ধর্ম। কোনোটির নাম নিউট্রিনো, কোনোটির নাম 'সাই', কোনোটির নামশুধু 'জে', কোনোটির নাম 'গ্র্যাভটন।'

এইসব কণিকা সময় সময় বিরাট পিণ্ডের সৃষ্টি করে। এই বিরাট পিণ্ডই কি জাহাজ, বিমান, মানুষকে গ্রাস করে? এই পিণ্ডই কি দেশ ও কালের অভিযাত্রী?

কালের পথ যাকে বিজ্ঞানীরা বলে 'টাইম ট্রাক' সেই পথে কণিকার এই পিণ্ড সচল পদার্থ ও জীবকে অচল করে কাল পরিক্রমায় এগিয়ে বা পেছিয়ে দেয়?

স্টার টাইগারের কোনো আহোরী বা ডেভিড ল্যাং-এর মতো কোনো চাষী বা মেক্সিকো প্রদেশে গ্রামের সেই এস্কিমোদের মতো কালের শিকার হয়ে টাইম-ট্র্যাকে এগিয়ে বা পেছিয়ে যায়?

১২

আমরা যখন এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি তখন কে যেন আমাদের পশ্চাৎ থেকে আকর্ষণ করছে·· বার্জ নেই···রেডিও বন্ধ · কম্পাস বিকল···

রহস্যের কি শেষ নেই?

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের অনেক রহস্যের মধ্যে হাল আমলের একটি রহস্যের প্রত্যক্ষদর্শী হলো ক্যাপটেন ডন হেনরি। ক্যাপটেন হেনরির পেশা ছিল ডুবে যাওয়া জাহাজ উদ্ধার করা। তার একটা স্যালভেজ কোম্পানিও ছিল, নাম ছিল, সি ফ্যানটম এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি, অফিস ছিল মিয়ামি শহরে।

ক্যাপটেন হেনরি নিজেই একবার বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলে রহস্যের শিকার হয়েছিল। রহস্যটা কি সেটা খুঁজে বার করবার জন্যে ডন হেনরি ঠিক করেছিল যে ইলেকট্রনিক কৌশলের সাহায্যে সমস্ত ট্র্যাঙ্গেল এলাকাটা সে ঘুরে দেখবে। এই পরিকল্পনা

কার্যকরী করতে আঠারো মাস সময় লাগবে। প্রচুর অর্থব্যয় হবে, তা হোক, তবুও একবার দেখতে হবে।

তবে ডন হেনরি যে রহস্যের শিকার হয়েছিল তা হলো তার টাগ-বোট "গুড নিউজ"কে নিয়ে এবং ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৫৮ সালে।

ডন হেনরি তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছিল ১৯৫৮ সালে এক টেলিফিসন প্রোগ্রামে। প্রোগ্রামের উদ্যোক্তা ডেফিড সাসকিণ্ড এবং গ্রন্থকার চালস বেরলিটজ অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত ছিলেন। বেরলিটজ হলেন 'দি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল' নামক বইয়ের খ্যাতনামা লেখক। ডন হেনরির কাহিনী বেরলিটজ তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন।

সমুদ্র ও নৌবিদ্যায় ডন হেনরির দক্ষতা প্রচুর এবং অভিজ্ঞতাও দীর্ঘ দনের। সে দুঃসাহসী। বিপদ-সংকুল সমুদ্রে পাড়ি দিতে বা সমুদ্রের নিচে নামতে ভয় পায় না। পেশীবহুল, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় চটপটে ও চতুর।

আগেই বলেছি ডন হেনরির টাগ-বোটখানার নাম 'গুড নিউজ'। এই টাগ বোটের সাহায্যে ডুবে যাওয়া জাহাজ তোলা হয়, বিকল জাহাজকেও টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

মিয়ামি ফোর্ট লডারডেল এলাকা থেকে যাত্রা করে গুড নিউজ যাচ্ছিল পুয়েরটো রিকোর দিকে। বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হবে। টাগ-বোটে নাবিক ছিল তেইশ জন এবং ক্যাপটেন স্বয়ং। একটা বেশ বড ও ভারি বার্জ টাগ-বোটখানা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

পুয়েরটো রিকো ছাড়বার তিন দিন পরে। সে যে কি অভিজ্ঞতা, কি ভূতুড়ে ব্যাপার, কি বিভীষিকা তা ভোলবার নয়।

ডন হেনরি বলছে : আমি একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে আমার কেবিনে ঢুকেছি এমন সময় আমার কেবিনের সামনে গোলমাল শোনা গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি গোলমাল শুধু আমার কেবিনের সামনে নয় সারা ডেক জুড়ে নাবিকেরা উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে, এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে।

আমাকে দেখেই চিফ অফিসার আমাকে ডেকে বলল, 'শীগগির একবার কম্পাসটা দেখে যাও।' তার চোখেমুখে রীতিমত ভয়।

কি হলো? কোনো অ্যাকসিডেন্ট? আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কম্পাসের আবার কি হলো? কেউ ভেঙে ফেলেছে? তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন।

—ভেঙে ফেললে তো মেরামত করা যেত, ঐ দেখ।

আমি কাছে গিয়ে দেখলুম গাইরো বাঁই বাঁই করে ডান দিকে ঘুরছে আর কম্পাসটা

যেন পাগল হয়ে গেছে। আমি এমন কখনও দেখি নি। কম্পাসের কাঁটাটা ঘুরছে তো ঘুরছেই। আমি জানি ম্যাগনেটিক কম্পাস ম্যাগনেটিক পোলের দিকে নয়, ঠিক উত্তর দিক নির্দেশ করে আর গাইরো কম্পাস নিজস্ব চুম্বক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে উত্তর দিকে কাঁটা স্থির রাখে।

কিন্তু এ কি ব্যাপার? এমন হচ্ছে কেন? এমন তো আমার জীবনে কখনও দেখি নি, শুনিও নি। এ আমরা কোথায়, কোন্ রাজ্যে এলুম? আমরা সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক মোটর পরীক্ষা করলুম সেখানে কোনো গোলমাল হলো নাকি? জেনারেটরের দিকে নজর রাখতে লাগলুম। আকাশে কি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে? সেই বিদ্যুৎ কি আমাদের জেনারেটরের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে? কিন্তু আকাশে সে রকম কোনো মেঘই নেই তবে আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে। ঝড়ের কোনো লক্ষণ নেই। আবহাওয়া শান্ত।

আমি ব্রিজের ওপর গেলুম। ব্রিজ মানে যে জায়গা থেকে টাগ-বোটটা পরিচালনা করা হয়। চারদিক একবার চেয়ে দেখলুম। কিন্তু আমি এ কি দেখছি? দূরে দিক-চক্রবাল দেখা যাচ্ছে না, আকাশ নেই, কোথায় জল শেষ হলো আর আকাশ আরম্ভ হলো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সমুদ্র বলে কিছু নেই যেন। সব একাকার হয়ে গেছে।

আমি সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখলুম কিন্তু কি দেখলুম? জল নয় শুধু ফেনা, ফেনা আর ফেনা, পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার রাশি, যেন দুধের সাগর।

আকাশ? আকাশও সাদা। সমুদ্র ও আকাশের মধ্যে কোনো তফাত নেই। আমরা কি জেগে স্বপ্ন দেখছি?

আমি একবার পিছন ফিরে দেখলুম। যে বার্জখানা আমরা টেনে আনছিলুম সে বার্জখানা নেই। দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়েও যায় নি কারণ আমরা সেরকম কোনো টান অনুভব করি নি। দড়ি ঠিকই রয়েছে এবং দড়িতে টানও রয়েছে শুধু বার্জখানাই নেই।

অতবড় একখানা বার্জ যা আমরা টেনে আনছিলুম সেখানা যদি দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যেত তাহলে টাগখানা সেই মুহূর্তে ছিটকে এগিয়ে যেত। একি ভৌতিক কাণ্ড? আমি সারা ডেক ছোটাছুটি করতে লাগলুম। বার্জের সঙ্গে বাঁধা দড়ি পরীক্ষা করলুম। বার্জ আছে বোঝা যাচ্ছে না কেন?

কি অদ্ভুত ব্যাপার একটু পরেই দেখলুম পিছনে বার্জখানা ঠিকই রয়েছে! আমাদের চারদিকে কুয়াশা নেই কিন্তু বার্জ ঘিরে ঘন কুয়াশা! আকাশ পরিষ্কার। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

আমি টাগের গতি বাড়িয়ে দিলুম। এ জায়গায় থাকতে আমার সাহস হচ্ছে না। আমরা এগিয়ে চললুম।

আমার ঘড়ি বোধহয় ঠিক চলছিল কারণ আমি এই বিভীষিকা দেখলুম বারো মিনিট ধরে। বারো মিনিট। আমরা কি সমুদ্রের ভেতর ডুবে গিয়েছিলুম নাকি কোনো কিছু আমাদের আচ্ছাদিত করে দিয়েছিল?

আমাদের টাগ-বোট যে চলছে তা বেশ বুঝতে পারছি কিন্তু কে যেন আমাদের টেনে ধরছে। কি টেনে ধরছে? দড়িটা অর্থাৎ টাউ-লাইন সাড়ে তিন ইঞ্চি মোটা, ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এসব কি হচ্ছে?

আমরা ক্রমশ সেই বিভীষিকার রাজ্য থেকে বেরিয়ে এলুম। বার্জখানা কেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল একবার দেখতে হচ্ছে তো? আমি একখানা নৌকো নামালুম। সেই নৌকোয় চেপে বার্জে গিয়ে উঠলুম। বার্জে উঠে তাপের পার্থক্য বেশ বোঝা গেল। বার্জখানা যেন গরম। খুব গরম নয়, হাত দিয়ে যে কোনো জায়গা ছোঁয়া যাচ্ছে।

ঐ বারো মিনিট সময়ের মধ্যে রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। জেনারেটর চললেও সেই সময়ে কোনো বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হয় নি আলোও নিবে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইটের পঞ্চাশটা ব্যাটারি ছিল। দেখা গেল প্রত্যেকটা অকেজো হয়ে গেছে। একেবারেই ফুরিয়ে গেছে, ফেলে দিতে হলো অথচ সেগুলি এই সেদিন পুয়েরটো রিকোতে কিনেছি এবং কেনবার সময় প্রতিটি টেস্ট করে নেওয়া হয়েছিল।

উক্ত টেলিভিসন প্রোগ্রামে এক প্রশ্নের উত্তরে ডন হেনরি বলে যে সে খুব ভয় পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে আবার বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলে ফিরে যাবে এবং ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রহস্য সমাধানের চেষ্টা করবে।

দি বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের লেখক চার্লস বেরলিটজ ঐ অনুষ্ঠানেই বলে যে সমুদ্রের যেখানে ডন হেনরি বিভীষিকা দেখেছিল ঠিক সেইখানে সমুদ্রগর্ভে বিরাট গিরিখাত আছে। এই গিরিখাত বা ক্যানিয়নটির নাম 'টঙ্গ্ অফ দি ওসেন' অর্থাৎ মহাসমুদ্রের জিভ। এখানে সমুদ্র বেশ গভীর।

ক্যানাডার কিংস্টনে সেণ্ট লরেন্স নদীগর্ভে একটি খাত আছে যার মধ্যে আকরিক লোহা বা উল্কা পিণ্ড সঞ্চিত আছে যার ফলে এখানে কম্পাস অকেজো হয়ে পড়ে।

ডন হেনরির টাগবোট গুড নিউজ-এ সেই বিভীষিকার সময় বৈদ্যুতিক শক্তির অস্তিত্ব ছিল না। চালু জেনারেটরটি থেকে কারেণ্ট পাওয়া যাচ্ছিল না। জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্যে যে আরও একটি জেনারেটর ছিল সেটিকে এঞ্জিনিয়ার

চালাতে পারেন নি।

আনআইডেনটিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট বা ইউ এফ ও অর্থাৎ উড়ন্তচাকা নিয়ে জন ওয়ালেস স্পেন্সার দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ কাজে লিপ্ত আছেন। তিনি বলেন বারমুডা ট্রাঙ্গল হলো গ্রহান্তরের জীবদের 'কলেকটিং বেসিন', সংগ্রহ পাত্র।

বিখ্যাত মার্কিন আধ্যাত্মিক টেড ওয়েন্স বলেন ইউ এফ ও-রাও একদিন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে।

সোসাইটি ফর দি স্টাডি অফ দি আনএক্সপ্লেনড এর প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী আইভান টি স্যাণ্ডারসন বলেন জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রে অতএব সমুদ্রের অভ্যন্তরে যে সভ্য জীব থাকবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। তারা আজকাল মাঝে মাঝে সমুদ্র-পৃষ্ঠে উঠে এসে মানব সভ্যতার নিদর্শন সংগ্রহ করে সাগরের অতলে নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু শেষ কথা এখনও কেউ বলতে পারে নি। কতকগুলি রহস্যের কেউ কেউ সমাধান করেছেন কিন্তু রহস্যের সম্পূর্ণ সমাধান করতে পারেন নি। যুক্তি ও তর্ক দিয়ে সব সময়ে সব রহস্যের সমাধান হয় না।

বারমুডা ট্রাঙ্গল নামকরণের পশ্চাতে। বারমুডা ট্রাঙ্গল রহস্য খুব পুরনো হলেও নামকরণ কিন্তু খুব পুরনো নয়। নামকরণ করেছিলেন ভিনসেন্ট এইচ গ্যাডিস নামে একজন প্রবন্ধকার। অজানা বা রহস্যময় জগৎ সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রবন্ধ ও বই লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। "মিষ্টিরিয়স ফায়ারস অ্যাণ্ড লাইটস" তাঁর একখানি বিখ্যাত বই। গ্যাডিস বলেন যে একটি ত্রিকোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে এই নামকরণ করাটা তাঁর ভুল হয়েছে কারণ এই রহস্যময় এলাকার সীমা ত্রিকোণের মধ্যে আবদ্ধ নয়।

একটি প্রবন্ধে গ্যাডস লিখছেন :

এটি এমন একটি এলাকা যেখানকার আকাশে বিমান হারিয়ে যায়, যেখানে জাহাজ অথবা কেবলমাত্র জাহাজের নাবিকেরা অদৃশ্য হয়ে যায়। ফ্লোরিডা উপকূল থেকে পুয়েরটো রিকো পর্যন্ত সোজা একটি লাইন টানা হোক তারপর উত্তর দিকে বারমুডা পর্যন্ত আর একটা লাইন এবং বারমুডা থেকে দক্ষিণ দিকে লাইন টেনে আবার ফ্লোরিডায় ফিরে আসা যাক। যত রহস্য সব এই ত্রিকোণের মধ্যে।

এই হলো বারমুডা ট্রাঙ্গল যা 'ফ্লাইং সসার' যা 'অ্যাবমিনেবল স্নোম্যান' প্রভৃতি নামের মতো ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফ্লাইং সসার যেমন সত্যিকারের উড়ন্ত পিরিচ নয় অ্যাবমিনেবল স্নোম্যান যেমন মানুষ নয় তেমনি 'বারমুডা' রহস্যও ঐ ত্রিকোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

'আরগসি' পত্রিকায় (১৯৬৪ ফেব্রুয়ারি) একটি প্রবন্ধের শিরোনাম হিসেবে নামটি

আমি প্রথম ব্যবহার করি এবং পরে নামটি আমার 'ইনভিজিবল হরাইজন' বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করি।

এই নাম ব্যবহার করে আমি বোধহয় ভুল করেছি কারণ রহস্য ঐ ত্রিকোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কোনো কোনো লেখক এটিকে ডিম্বাকৃতি বলেছেন। রিচার্ড ওয়াইনার, যিনি টেলিভিসনে তথ্যমূলক অনুষ্ঠান 'দি ডেভিলস সি' প্রচার করে থাকেন তিনি অবশ্য "দি ডেভিলস ট্র্যাঙ্গল" নামে একটি বই লিখেছেন অর্থাৎ আমার মতো তিনি ত্রিকোণের বাইরে আসেন নি অন্তত নাম নির্বাচনে।

অবশ্য তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন এটি আসলে একটি ট্র্যাঙ্গল নয় বরঞ্চ ট্র্যাপিজিয়ম আকারের চতুষ্কোণ বলাই উচিত। যাই হোক তবুও সসার শব্দটির মতো ভুল অর্থে হলেও 'ট্র্যাঙ্গল' কথাটি চালু হয়ে গেছে।

বস্তুত ক্যারিবিয়ান সমুদ্রকে ঘিরে একটি সীমানাহীন অঞ্চলে এবং হারানো জাহাজ সমূহের কবরখানা সারগাসো সি সমেত অ্যাটলান্টিকের মধ্যে এই সব সামুদ্রিক রহস্য ঘটছে।

সাধারণ যে সব দুর্ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে এই সব রহস্যের পার্থক্য হচ্ছে যে দুর্ঘটনার কোনোই প্রমাণ পাওয়া যায় না। না পাওয়া যায় ধ্বংসাবশেষ বা মৃতদেহ এমন কি সমুদ্রপৃষ্ঠে তেল ভাসতেও দেখা যায় না।

'আরগসি' পত্রিকায় আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকদের কছে থেকে আমি অনেক চিঠি পাই যার মধ্যে একখানি চিঠি লিখেছিল জেরাল্ড সি হকস্। কোরিয়াতে ডিউটি সমাপ্ত করে জেরাল্ড হকস্ ১৯৫২ সালে হেটসে ফিরে আসে। ফিরে এসে সে আর তার বন্ধু নিউইয়র্কের একজন সাজন স্থির করে যে ওরা বারমুডায় কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে আসবে। এই উদ্দেশ্যে দুই বন্ধু একদিন নিউইয়র্ক থেকে বি ও এ সি-এর চার এঞ্জিন যুক্ত একটি বিমানে চেপে বসল। আকাশে ঝোড়ো মেঘ জমে ছিল, বিমান ঝোড়ো মেঘের ওপর দিয়ে উড়তে লাগল। নিস্তরঙ্গ নদীতে বিমান যেন গা এলিয়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল। যাত্রীরা বুঝতেই পারছিল না যে তারা বিমানে উড়ে যাচ্ছে। তারপর ?

বিমানখানা হঠাৎ যেন দুম করে দুশো ফুট নিচে পড়ে গেল। একেবারে সোজা, নাক গুঁজে নয়। একখানা বই যেন কেউ ধপ করে ফেলে দিলো। যাত্রীরা আসনচ্যুত হয়েছিল। তারা আবার যখন উঠে বসবার চেষ্টা করছে এবং কেউ কেউ বসেছেও ঠিক তখনি বিমানখানা উড়ন তুবড়ির মতো সোজা ওপরে উঠে গেল। এই রকম একবার নয়, বার বার হতে লাগল, আধঘণ্টা ধরে। বিরাট দৈত্য যেন তার সুবিশাল হাতের চেটো দিয়ে বিমানখানাকে থাবড়ে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে আর অপর হাতের

চেটো দিয়ে বিমানখানা আবার তুলে দিচ্ছে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে যে দুটো প্রবল শক্তি বিমানখানাকে নিয়ে টানাটানি করছে আর তার ফলে বিমানখানা যেন যন্ত্রণায় দারুণ কাতর হয়ে যাচ্ছে। বিমানের ডানা দুটির ডগা কুড়ি ফুট পর্যন্ত ওঠানামা করছে।

যাত্রীরা সকলে ভীত। ক্যাপটেন অভয় দিয়ে বলল বিমান ভেঙে যাবে না কিন্তু সে তার চেয়েও কঠিনতর এক সমস্যার সম্মুখীন। বারমুডা কোন্ দিকে তা সে স্থির করতে পারছে না, রেডিও যোগাযোগও করতে পারছে না, কারও সঙ্গে নয়, না ইউনাইটেড স্টেটসের না বারমুডার সঙ্গে।

কি করবে ক্যাপটেন স্থির করতে পারছে না। ওরা ফ্লোরিডায় ফিরেও যেতে পারে, সে পরিমাণ ফুয়েল বিমানে আছে অথবা বারমুডার দিকেও যেতে পারে। বারমুডার দিকে রেডিওশিপ থাকে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অসম্ভব নয়।

বিমান ওঠানামা ক্রমশ কমে আসছে তাই লক্ষ্য করে যাত্রীদের সাহস ফিরে এলো। তারা বলল ফিরে গিয়ে কাজ নেই, বারমুডার দিকেই যাওয়া যাক।

ইতিমধ্যে ককপিটে বসে রেডিও অপারেটর মূল ভূখণ্ড বা বারমুডার সঙ্গে যোগাযোগ করার খুব চেষ্টা করছে। অবশেষে সাড়া পাওয়া গেল, স্পষ্ট। রেডিওশিপ থেকে উত্তর পাওয়া গেল এবং একটু পরে বারমুডাও পাওয়া গেল।

জেরাল্ড হক ও তার বন্ধু লক্ষ্য করেছিল যে আকাশ পরিষ্কার, যা ঘটে গেল তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। কেন এমন হলো তার কোনো সূত্র পাওয়া গেল না।

এইখানেই জেরাল্ড হক তার কাহিনী শেষ করেছে। সে লিখেছে যে তারপর দশ বছর পার হয়ে গেছে। আজও সে শিহরিত হয় সেই কাহিনী মনে পড়লে কারণ তারপর বেশ কয়েকটি বিমান অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে। একটু হলেই সে এবং তার বন্ধু বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের শিকার হতো।

আমেরিকার টেলিভিসনে ডিক ক্যাভেটের একটা প্রোগ্রাম আছে। সেই প্রোগ্রামে নানারকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ মার্চ তারিখে ডিক ক্যাভেটের প্রোগ্রামে হাজির ছিল বিখ্যাত বৈমানিক আর্থার গডফ্রে এবং আইভ্যান টি স্যাণ্ডারসন।

বায়ুমণ্ডলের চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব উল্লেখ করে আর্থার গডফ্রে বলে যে প্রায় একুশ মাইল দূরত্ব বাঁচাবার জন্যে অনেক বৈমানিক নিউ ইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডার পথে যাতায়াত করে কিন্তু তখন তারা তাদের কম্পাসের ওপর বিশেষ নজর রাখে।

আরও একটি 'ডেভিলস সি' আছে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের দক্ষিণে বোনিন আইল্যাণ্ডের পুব দিকে। জেলে নৌকো ক্রমাগত নিখোঁজ হওয়ায় জাপান সরকার উৎকণ্ঠিত হয়ে সন্ধানী জাহাজ পাঠিয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউ এস এয়ারফোরসের অনেক বিমান জাপান থেকে গুয়ামের পথে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হতে থাকে। আর্থার গডফ্রে বলে যে এই বিমানপথে রেডিও স্তব্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

পৃথিবীতে দশটি রহস্যজনক ক্ষেত্রের উল্লেখ করে স্যাণ্ডারসন বলে যে এই রহস্যজনক ক্ষেত্রগুলিতে একটা সময়-সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে যে এই অঞ্চল পার হয়ে বিমান গন্তব্যস্থলে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছচ্ছে না, হয় আগে না হয় পরে।

এ ছাড়া অনেক সময় দৃষ্টি বিভ্রম হয়। আকাশ সমুদ্র সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়। কোথা দিয়ে বিমান যাচ্ছে কিছুই অনুমান করা যায় না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বিখ্যাত সেই পাঁচটি টিবিএম এ্যাভেঞ্জার বিমানের ঘটনা।

ক্যারোলিন কসচিও ২৭বিশ বৎসর বয়স্ক একজন নার্স। ১৯৬৯সালের ৬ জুন তারিখে সে পমপানো বিচে একখানা সেসনা-১৭২ বিমান ভাড়া করে এবং একজন পুরুষ সঙ্গী নিয়ে জ্যামাইকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। বাহামা দ্বীপে জজ টাউনে সে বিমানে তেল ভরে গ্রাণ্ড টুর্ক আইল্যাণ্ডের দিকে পাড়ি দেয়। এখানে আবার তেল ভরতে হবে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় গ্রাণ্ড টুর্ক টাওয়ারের অপারেটর মহিলার কাছ থেকে একটা বার্তা পায়।

মহিলা রীতিমতো শঙ্কিত তার কম্পাস ঠিক কাজ করছে না। সে জানতে চাইছে এখন সে কোথায় আছে। সে দিক ঠিক করতে পারছে না। কণ্ট্রোল টাওয়ার থেকে কতদূরে এবং কোন্ দিকে সে আছে তাকে জানিয়ে দেওয়া হোক।

ক্যারোলিন কসচিও বলল সে দুটো দ্বীপের ওপর চক্র দিচ্ছে কিন্তু নিচে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না। অ্যামবারগ্রিজ চে হোটেলের বোর্ডাররা সেই সময় একখানা বিমানকে আকাশে চক্র দিতে দেখেছিল। জেট বিমানের একজন পাইলট মিস কসচিওকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু মিস কসচিওর পজিশন জানা না থাকায় সে কিছু করতে পারে নি।

মিস কসচিওর শেষ বার্তা হলো তার ফুয়েল শেষ হয়ে গেছে। অনুসন্ধানকারীরা তার বা তার বিমানের কোনো খোঁজ পায় নি। সেই হোটেলের বোর্ডাররা বলেছিল যে আকাশ বেশ পরিষ্কার কিন্তু মিস কসচিও বলে যে নিচে কি আছে সে বুঝতে পারছে না।

মহিলা যদি হোটেলটিও দেখতে পেতেন বা দ্বীপ দুটির আকৃতি বলতে পারতেন

অহলে তিনি কোথায় আছেন তা জানিয়ে দেওয়া যেত। মহিলার শুধু দিকভ্রম নয় দৃষ্টি বিভ্রমও হয়েছিল।

আকাশে চুম্বক ক্ষেত্রে আলোড়ন সাংঘাতিক ভীতি ও বিভ্রম সৃষ্টি করে। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর চাক ওয়েকলি আর কো-পাইলট শ্যাম ম্যাথিস বিমিনি থেকে মিয়ামি উড়ে যাচ্ছিল। ওদের পাইপার অস্তেক বিমান তখন অটোম্যাটিক পাইলটের সাহায্যে চলছিল। ওরা তখন অ্যানড্রস আইল্যাণ্ডের আট হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

ওয়েকলি বলছে : আমি জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলুম। বিমানের ডানার দিকে হঠাৎ আমার নজর পড়ল। আমার মনে হলো ডানা যেন স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে এবং ডানা থেকে একটা নীলাভ জ্যোতি উদ্ভাসিত হচ্ছে।

সেই নীলাভ জ্যোতির উজ্জ্বলতা ক্রমশ বাড়তে লাগল, বাড়তে বাড়তে সেই জ্যোতি আমাদের ককপিটে এসে গেল এবং ইনস্ট্রুমেণ্ট নির্দেশক সমস্ত আলোগুলি সেই জ্যোতির প্রভাবে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। আমাদের সব যন্ত্র যেন বিকল হয়ে গেল। প্রথমে গেল অটো-পাইলট তারপর ইলেকট্রিক যন্ত্রগুলি যেন পাগল হয়ে গেল। ফুয়েল ট্যাংক অনেকটা খালি ছিল, এখন যেন তা ভর্তি হয়ে গেল। তারপর দেখি কম্পাসের কাঁটা আস্তে আস্তে ঘুরছে তো ঘুরছেই।

আমাদের ফ্লোরিডার দিকে যাবার কথা কিন্তু সে তখন চলেছে বিমিনির দিকে, যেদিক থেকে আমরা এলুম। আমরা অসহায়, কিছুই করতে পারছি না।

তখন অনেক রাত্রি। দূরে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কম্পাস এবং সব যন্ত্রপাতি অচল। আমরা কি করতে পারি ? বিমানখানা যাতে সোজা হয়ে উড়তে পারে আমরা সেই চেষ্টা করতে থাকলুম।

আমরা ন্যাসো টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলুম আর অবাক কাণ্ড ! সেই জ্যোতি কোথায় সরে গেল, যন্ত্রপাতি এবং সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। মাত্র পাঁচ ছ মিনিটের মধ্যে হঠাৎ সব পরিষ্কার।

আমার একজন বন্ধু আছে, তার নাম ক্যাপটেন রবার্ট জে ডুরাণ্ট, কোনো একটি এয়ারলাইনের পাইলট। আইভান টি স্যাণ্ডারসন প্রতিষ্ঠিত সোসাইটি ফর দি ইন-ভেস্টিগেশন অফ দি আন এক্সপ্লেনড-এর (SEAS) আমরা দু'জনেই সভ্য।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের অদৃশ্য শক্তির কবল থেকে আমার বন্ধু একবার আশ্চর্যজনক ভাবে রক্ষা পেয়েছিল। সঙ্গত কারণেই বিমান কোম্পানি ঘটনাটি দীর্ঘদিন গোপন রেখেছিলেন। ঘটনা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়লে যাত্রীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হলে কোম্পানি বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই ছিল আশঙ্কা।

ঘটনাটি উক্ত সোসাইটির কোয়ার্টার্লি পত্রিকা 'পারসুট'-এর ১৯৩৩ সালের জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রবার্ট একদিন তার বিমান নিয়ে স্যান জুয়ান থেকে নিউ ইয়র্ক উড়ে যাচ্ছিল। তার বিমান তখন ঊর্ধ্ব গগনে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে। বিমানে মাঝে মাঝে যাত্রী-দের ঝাঁকুনি লাগে যাকে বলে 'বাম্প'। বাতাসের জোর না থাকলেও মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি লাগে।

রবার্ট লক্ষ্য করল যে এখানে বিমানের মৃদুতম ঝাঁকুনিও লাগছে না। এখানে যেন বাতাস নেই, যে বাতাস বইছে তা সুষম। সমতল ভূমির ওপর দিয়ে মোটর গাড়ি চললে যেমন একটুও ঝাঁকুনি লাগে না এও যেন সেই রকম।

এই রকম কয়েক মিনিট চলল। রবার্ট হঠাৎ লক্ষ্য করল উইংশীল্ডের ওপর স্থির-বিদ্যুতের প্রলেপ। ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু নয়। বিমান যখন ঘন মেঘের ভেতর দিয়ে উড়ে যায় তখন এই রকম স্থির-বিদ্যুৎ দেখা যায়। ঝোড়ো মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। তবে পার্পল রঙের এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ কোনো ক্ষতি করে না। নির্মেঘ আকাশে এমন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ কখনও দেখা যায় না।

বিমান যতই এগিয়ে যাচ্ছে সেই স্থির-বিদ্যুতের প্রলেপের পরিধি উইংশীল্ডের ওপর ততই বিস্তার লাভ করছে এবং এক সময়ে পুরো উইংশীল্ডখানা সাদা জ্যোতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বিমান তখনও সেই সুষম বায়ুস্তরের ভেতর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর সেই জ্যোতির গভীরতাও যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিমান এখন চলছিল অটো পাইলটের সাহায্যে। বিমান উড়ছিল সম উচ্চতায় এবং যাচ্ছিল সোজা পথে। কো-পাইলট সহসা লক্ষ্য করল যে ককপিটে তার দিকে অটোপাইলটের মনিটর অন্য দিক নির্দেশ করছে, বিমানের মুখ ঘুরে গেছে। কো-পাইলট তার গাইরো দেখল কিন্তু সেখানে তো সব ঠিক আছে, গোলমাল নেই।

আশ্চর্যের বিষয় যে ককপিটে ক্যাপটেন এবং কো-পাইলট, এই দু'জনের দু'দিকের যন্ত্রপাতিতে পার্থক্য দেখা যেতে লাগল। উভয়ের গাইরো এবং কম্পাস দু'রকম নির্দেশ দিচ্ছে।

জেট প্লেনটির পক্ষে অবস্থা তখন অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিমান চলে এই সব নির্দেশক যন্ত্রপাতির সহায়তায়। যন্ত্রপাতিতে গোলমাল ঘটে এবং ঘটলেও তার প্রতিকার আছে কিন্তু এ কি? এ যে অসম্ভব ব্যাপার। কোনো যন্ত্রই ঠিকমতো কাজ করছে না। কোন্ যন্ত্রের নির্দেশ মানা হবে? অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে তবে বিমান কিন্তু তখনও ঠিক উড়ে চলেছে। কতক্ষণ উড়বে কে জানে? পর মুহূর্তে

কি হবে তাই বা কে জানে ?

ককপিটে দুটি গাইরো ছাড়া ক্যাপটেনের কাছে ব্যাটারি চালিত একটি গাইরো ছিল। ক্যাপটেন সেই ব্যাটারি চালিত গাইরোর নির্দেশ মেনে চলতে লাগলেন। ওরা এখন বারমুডার একশ' মাইল দক্ষিণে। বারমুডায় দূরপাল্লার একটি ভালো রাডার কাছে। রাডার স্ক্রীনে বিমানের অস্তিত্ব নিশ্চয় টের পাওয়া যাচ্ছে। বিমানের রেডিও তখনও বিকল হয় নি। ক্যাপটেন বারমুডা কণ্ট্রোল টাওয়ারে বার্তা পাঠালেন আর কোনো ঘটনা ঘটল না। বিমান নিরাপদে ল্যাণ্ড করল।

বারমুডা এয়ারপোর্টে মেকানিকেরা বিমানের কোনো যন্ত্রে কোনো ত্রুটি দেখতে পেল না তবে তারা বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্য জানত তাই মাথা চুলকোতে লাগল।

টেলিফোন মাধ্যমে নিউ ইয়র্কে বিমান কোম্পানির টেকনিক্যাল সেণ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। তারা বলল এমন হতেই পারে না, অসম্ভব। যাই হোক জেটখানা দিনের আলোয় নিউ ইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। আর কোনো ঘটনা ঘটে নি।

নিউ ইয়র্কে এঞ্জিনিয়াররা বিমানের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে বলল যন্ত্রপাতিগুলির ওপর হঠাৎ বেশি মাত্রায় বৈদ্যুতিক শক্তির চাপ পড়েছিল। বাজ পড়ার ফলে এমন হতে পারে। কিন্তু বাজ কোথায় ? আকাশে মেঘই ছিল না। বাজ পড়লে কি প্রতিক্রিয়া হয় পাইলটরা তাও জানে। উজ্জ্বল ফ্ল্যাশ, তারপর জোর আওয়াজ কিন্তু উইণ্ডশীল্ডে। স্থির বিদ্যুতের প্রলেপ পড়ে না।

গ্রেট ব্রিটেন থেকে আগত চার এঞ্জিনের একটি টারবো-প্রপ বিমান সেই সময়ে বারমুডায় ল্যাণ্ড করেছিল। তারও ককপিটে যন্ত্রপাতিতে গোলমাল দেখা দিয়েছিল কিন্তু রবার্ট তখন নিজের ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে ঐ টারবো-প্রপ বিমানের পাইলটের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে নি।

তাহলে ব্যাপারটা কি ? তড়িৎ চুম্বকের নিবিড় ক্ষেত্র ? দৃষ্টিবিভ্রম ? দেশ ও কালের কোনো ব্যাপার ? রেডিও বিকল হওয়ার কোনো ক্ষেত্র ? নাকি অন্য কিছু ?

স্যাণ্ডারসন সায়েব পৃথিবীতে দশটি অথবা বারোটি 'বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের মতো' এলাকা খুঁজে পেয়েছেন যেখানে প্লেন বা জাহাজ মাঝে মাঝে এই রকম বিপদে পড়ে যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

যে সব জাহাজ বা বিমান সম্পূর্ণ ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা কি বাতাসে মিলিয়ে গেছে ? অভূতপূর্ব ঘটনার ব্যাখ্যাও বুঝি অভূতপূর্ব।

অনেক ক্ষেত্রে জাহাজের নাবিকেরা অদৃশ্য হয়েছে অথচ জীব-জন্তুরা যথা কুকুর, বেড়াল বা পাখি থেকে গেছে। পরে মানুষদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়

নি। অন্য জগতের কোনো প্রাণী এসে কি তাদের তুলে নিয়ে গেছে?

অ্যাপলো স্পেসশিপের অ্যাস্ট্রোনটরা চাঁদে যাবার পথে বারমুডা ট্রাঙ্গল এলাকার সমুদ্রে সাদা জল দেখে বিস্মিত হয়েছে। বিমানে যারা খুব বেশি উচ্চতায় উড়ে বেড়ায় তারাও ঐ সাদা জল দেখে বিস্মিত হয়েছে। সমুদ্রে এমন সাদা জল তাও দূর আকাশ থেকে আর কোথাও তো দেখা যায় না।

এই অঞ্চলে সমুদ্রের নিচে নিরন্তর এমন কিছু আলোড়ন চলছে যার জন্যে ওপরের জল সাদা হয়ে যায়? একদা প্রাচীনকালে ওখানে হয়তো কোনো সভ্যতা ছিল। তাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম চালাবার জন্যে শক্তির উৎসটি এখনও সমুদ্রে রয়ে গেছে এবং সেটি এখনও সক্রিয়। শক্তির সেই উৎস এখনও কি মাঝে মাঝে চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে জাহাজ-আদি যান সমুদ্রগর্ভে টেনে নেয়?

বিমিনির পশ্চিমে তিরিশ ফুট জলের নিচে মানুষের তৈরি পাথরের বিরাট বিরাট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এডগার কে সি বলেন এইখানেই একদা আটলান্টিস নামে মহাদেশে ছিল। সেই মহাদেশের অধিবাসীরা স্ফটিক থেকে শক্তি আহরণ করত। বর্তমান কালে প্রচলিত লেসার বিম-এর তুল্য ছিল সেই শক্তি।

দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন উপত্যকার লুপ্ত সভ্যতার মানুষরাও নাকি স্ফটিক থেকে তাদের শক্তি আহরণ করত। তার সাহায্যে তারা নাকি নিজেরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত।

মহাশূন্যের কোথাও নাকি ঠিক আমাদের মতো সূর্য-কেন্দ্রিক গ্রহমণ্ডল আছে। এই গ্রহমণ্ডলের মধ্যে কোথাও একটা যোগাযোগ আছে। সেই যোগাযোগের সূত্র ধরে মানুষ বা জীব চালান হয়ে যাচ্ছে। যোগাযোগের সূত্র নাকি বারমুডা ট্রাঙ্গেলের মতো ঐ বারোটি এলাকা। অনেকে বিশ্বাস করে দুই গ্রহমণ্ডলের মধ্যে এই পথেই নাকি ঐসব ইউ এফ ও-এর উৎপত্তি হচ্ছে।

যে সব মানুষ অদৃশ্য হয়েছে তারা আর ফিরে আসে নি। ফিরে এলে তাদের কাছ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু এখনও তা সম্ভব হয় নি। ইউ এফ ও রহস্য সমাধান করবার মতো আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি হয়তো এখনও উন্নত হয় নি। কে জানে ভবিষ্যতে আমরা হয়তো সে রহস্য সমাধান করতে পারব। চাঁদে হয়তো পৌঁছতে পেরেছি কিন্তু তার বাইরে আরও অনেক রহস্য আছে।

বিস্মৃতির জগতে বিচরণ। এই সেদিনের কথা। ১৯৭৪ সালের মার্চ মাস। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে 'সাবা-ব্যাংক' নামে ৫৪ ফুট একটা ট্রলার-ইয়ট কোথায় হারিয়ে গেল। ১০ মার্চ তারিখে তরণীটি ন্যাসো বন্দর ত্যাগ করল। মিয়ামির দক্ষিণে ডিনার কি

নামে ছোট্ট একটি বন্দরে ৮ এপ্রিল তারিখে তরণীটির ভেড়বার কথা। তরণীর মালিক হলো ডেলাওয়ার স্টেটের উইলমিংটন শহরের ভ্যাকো করপোরেশন। তরণী ডিনার কি বন্দরে ভিড়লে তারপর তাকে পাঠান হবে অন্যত্র। কিন্তু সেই ট্রলার-ইয়ট ডিনার কি বন্দরে তো এসে পৌছলই না। ন্যাসো বন্দর ছাড়বার পর সে যে কোথায় গেল, তার কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না।

'সাবা-ব্যাংক'-এ ছিল তার ক্যাপ্টেন বত্রিশ বছর বয়স্ক সাই জেনটার এবং তার তিরিশ বৎসর বয়স্ক কাজিন এলিয়ট কোহেন। দুজনেরই বাড়ি ফিলাডেলফিয়ায়। আর ছিল নিউ জার্সির রাফায়েল কাপলান, বয়স ছাব্বিশ এবং এদের বন্ধু জন টার-কিনিও। ইটন বয়সে এদের সকলের চেয়ে বড়। এরও বাড়ি নিউ জার্সিতে।

বলা বাহুল্য যে এই ট্রলার-ইয়টখানি সর্বাধুনিক। এঞ্জিন এবং যাবতীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কোনো খুঁত রাখা হয় নি। তীরের সঙ্গে বার্তা বিনিময় বা অন্যান্য খোঁজ খবরের জন্যে রেডিও, রাডার, এমারজেন্সি বিকন সবই ছিল। কোনো কিছুর ত্রুটি রাখা হয় নি। প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল।

নির্ধারিত তারিখে ইয়ট যখন আমেরিকায় পৌছল না তখন কোস্ট গার্ডদের সতর্ক করে দেওয়া হল। মিয়ামির কোস্ট গার্ড ১০ এপ্রিল তারিখে ক্যারিবিয়ান সাগরের ছোট বড সকল বন্দরে রেডিও বার্তা পাঠাল : সাবা-ব্যাংক নিখোঁজ হয়েছে, তোমরা কিছু খবর জান ? কোস্ট গার্ড একবার খবর পাঠিয়েই নীরব রইল না। তারা প্রতি-দিনই জরুরী বার্তা পাঠাতে লাগল।

কোনো বন্দর থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। কোনো বন্দরেই সাবা-ব্যাংক আসে নি।

অবশ্য রেডিও বার্তা পাঠান ছাড়া কোস্ট গার্ড বিশেষ ভাবে সাবা-ব্যাংকের জন্যেই কোনো অনুসন্ধান চালায় নি। সেটা সব সময়ে সম্ভব নয় কারণ তাদের হাতে আরও অনেক অনুসন্ধানের কাজ থাকে। তাদের যে সব প্লেন বা জাহাজ টহল দেয় ব্যাপারটা তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারাই সমুদ্রে খোঁজ-খবর করছিল।

সাবা-ব্যাংক এর খবর না পেয়ে ভ্যাকো করপোরেশন মিয়ামির ক্যাপটেন ল্যারি মেনকেসকে নিযুক্ত করল। সাবা-ব্যাংক-এর ক্যাপটেন সাই জেনটারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল এবং দু'জনে একসময়ে একই সঙ্গে জাহাজে কাটিয়েছে তাছাড়া এলিয়ট কোহেনের দাদার সঙ্গে মেনকেস পড়াশোনা করেছে। এতএব ওদের পরিচিত।

সাবা-ব্যাংক খুঁজে বার করার ভার দেওয়া হলো মেনকেসের ওপর। ভ্যাকো কর-পোরেশন একটা প্লেন চার্টার করল। মেনকেস সেই প্লেনে চেপে সারা ক্যারিবিয়ান সাগর তোলপাড় করতে লাগল। সম্ভব অসম্ভব সর্বত্র অনুসন্ধান করা হতে লাগল।

মেনকেসের আত্মবিশ্বাস প্রবল। সাবা-ব্যাংক-কে যদি কেউ খুঁজে বার করতে পারে তো সেই পারবে। ইয়টখানার হয় কোনো যান্ত্রিক গোলোযোগ হয়েছে কিংবা হয়তো জেনারেটরের কোনো গোলমাল হয়েছে। জাহাজ চলাচলের পথ থেকে ইয়ট-খানা হয়তো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ক্যারিবিয়ন তো আর ছোট একটা লেক নয় যে গেলুম আর পেয়ে গেলুম, দুই এক সপ্তাহ সময় তো লাগবেই কিন্তু ঠিক খুঁজে বার করবই। যাবে কোথায়?

দুই এক সপ্তাহ তো পার হলোই। অনেকগুলো সপ্তাহ পার হলো। সপ্তাহের হিসাব পার হয়ে কয়েকটা মাস পার হলো কিন্তু সাবা-ব্যাংক-এর টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। নানারকম গুজবও শোনা যেতে লাগল।

সম্ভাব্য সকল স্থানে অনুসন্ধান করেও যখন সেই ট্রলার-ইয়টের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না তখন ক্যাপটেন ল্যারি মেনকেস নিরাশ হয়ে বললেন: হায় আমি যদি ইয়টখানা হারিয়ে যাওয়ার কারণও অনুমান করতে পারতুম! কিন্তু আমি তাও পারছি না।

সাবা-ব্যাংক যে সময় হারিয়ে গেল সেই সময়ে একজন ঝানু পাইলট বাহামা দ্বীপের ফ্রিপোর্ট থেকে আমেরিকায় পাম বীচে উড়ে আসছিলেন। তিনি বলেন যে সামনে ও পিছনে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত দীর্ঘ একটা কৃষ্ণবর্ণ সুড়ঙ্গের ভেতরে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন। কিসের সুড়ঙ্গ? মেঘ? ধোঁয়া? কোনো গ্যাস? তা তিনি বলতে পারেন না। মেঘ ও ধোঁয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে, কুয়াশাও তাঁর অপরিচিত নয়। তিনি তো দীর্ঘ দিন প্লেন চালাচ্ছেন। গ্যাসেও কোনো গন্ধ তিনি পান নি তবে এই সুড়ঙ্গ কোথা থেকে এলো? তিনি ভয় পেয়ে গেলেন যখন তাঁর ঘড়ি, রেডিও এবং কম্পাস অচল হয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে সেই পাইলট সেই 'ব্ল্যাকটানেলের' বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন বা ধাক্কা দিয়ে তাঁর প্লেন-খানা কেউ বার করে দিয়েছিল কিনা তাও তিনি ঠিক করে বলতে পারছেন না।

সাবা-ব্যাংক কি সেই সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে আর বেরিয়ে আসতে পারে নি? সেই সুড়ঙ্গ কি জাহাজ ধরার ফাঁদ?

রহস্যের পর রহস্য। যদিও 'বারমুডা ট্র্যাঙ্গল'ব্যাপারটাকে বলা হয়েছে "শতাব্দীর রহস্য" তাহলেও অন্যত্র এবং স্থলেও অনেক রহস্য ঘটছে যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বারমুডা ট্র্যাঙ্গলের পাশেআমেরিকাতেই কত রহস্য কাণ্ড ঘটছে। বলতে গেলে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকার মধ্যেই ফ্লোরিডায় যে লেক ওয়েলস আছে সেখানে মোটর নিয়ে দলে দলে মেয়ে পুরুষ বেড়াতে যায়। লেক ওয়েলসের কাছে

আর একটা জায়গা আছে যার নাম স্পুক হিল।

গাড়ি নিয়ে হিলের ওপর উঠে যাও তারপর গড়গড় করে নেমে এসে যেই এঞ্জিন বন্ধ করবে অমনি মনে হবে তোমার গাড়ি কে উলটো দিকে টানছে, যেন কেউ ব্যাক গিয়ার দিয়েছে। কিন্তু তা তো নয়। কেউ নেই তো গাড়ি উলটো দিকে কে টানবে?

স্থানীয় লোকেরা বলে একজন আছে, তাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, সে হলো একজন জলদস্যু অর্থাৎ পাইরেটের ভূত। ভূত? ঘোস্ট? হ্যাঁ। ভ্যানিলা আলভারেজ নামে একজন পাইরেট ছিল সেকালে। তাকে ঐ স্পুক হিলের গোড়ায় কবর দেওয়া হয়েছিল। সেই ভ্যানিলা আলভারেজ আজও ভূত হয়ে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফ্লোরিডার উত্তরে নর্থ ক্যারোলিনা, সমুদ্রের ধারে। সমুদ্রের উপকূল এখানে ভাঙা ভাঙা। কোন্ সুদূর অতীতে ঝড়ে আছাড় খেয়ে জাহাজ, নৌকো ভেঙে গিয়েছিল তার ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়।

ঐ সব ভাঙা জাহাজ থেকে জলদস্যুগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত রত্নের আশায় অনেকে জলে ডুবুরি নামাত কিন্তু কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে বলে শোনা যায় নি।

প্রাচীনকালের সেই সব জাহাজ দেখবার জন্যে ট্যুরিস্টদের ভিড় হতো কিন্তু ভাঙা জাহাজের আকর্ষণও ক্রমে কমে গেল। তবুও কমে যাওয়া ট্যুরিস্টদের মধ্যে কারও কারও ফিরতে হয়তো দেরি হতো। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি হয়ে যেত।

একদিন রাত্রের অন্ধকারে কোনো একজন ট্যুরিস্ট লক্ষ্য করল যে সমুদ্রের জলে এবং সংলগ্ন তীরভূমিতে একটা আলো যেন নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জল থেকে জমিতে আসতে এবং জমি থেকে জলে যেতে তার গতি ক্ষিপ্র। কিসের আলো? কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না। আলেয়া? রোজই একই স্থানে আলেয়া দেখা যায় না। কাছে গেলেও কোনো আলোর অস্তিত্ব নেই।

স্থানীয় লোকেরা কি বলে? সেই একই কাহিনী। সেই ভূত। জলদস্যুর ভূত। সেই জলদস্যুর নাম 'ব্লাকবেয়ার্ড'। আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত পাইরেট।

ব্রিটিশ নৌবহরের নাবিকেরা তাকে ১৭১৮ সালে ধরে এবং ঐ স্থানে তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। ব্লাকবেয়ার্ডের ধড় নাকি আলো জেলে তার কাটা মুণ্ড খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আলোর রহস্যের সমাধান হয় নি কিন্তু আলো দেখতে ট্যুরিস্টের ভিড় বেড়েছে।

নর্থ ক্যারোলিনার কেপ হ্যাটেরাসের কাছে আছে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। দ্বীপের নাম ফোর্ট র‍্যালে। কলোনি স্থাপনের উদ্দেশ্যে, ১৫৮৫ সালে স্যার ওয়ালটার র‍্যালে এক'শ জন নরনারীকে এনে এই দ্বীপে বসিয়েছিলেন। কলোনি বেশ জমে উঠেছিল কিন্তু আয়ু তার দীর্ঘস্থায়ী হলো না।

ইংলণ্ড থেকে মালপত্র নিয়ে জাহাজ এসে ঐ দ্বীপে ভিড়ত। স্পেনের সঙ্গে ইংলণ্ডের যখন যুদ্ধ চলছিল তখন মাঝে বছর তিন কোনে জাহাজ আসে নি। তিন বছর পরে জাহাজ এসে দেখল যে কলোনিতে জনমনিষ্যি নেই কিন্তু তারা যে কোথায় গেল তা আজও রহস্যে ঘের

সমস্ত বাড়ি খালি কেবল দেখা গেল বড় বড় ইংরেজি অক্ষরে একটা গাছের মোটা গুঁড়িতে কে খোদাই করেছে CROATOAN। শব্দটির অর্থ বা উদ্দেশ্য উদ্ধার করা যায় নি। ঐ দ্বীপে অবশ্য আজ বসতি গড়ে উঠেছে কিন্তু সেই দ্বীপের আদি অধিবাসীরা যে কোথায় গেল তার কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। দ্বীপের আর এক নাম 'দি লস্ট কলোনি।'

প্রশান্ত মহাসাগরের তীর ঘেঁষে উত্তর ক্যালিফোরনিয়া, অরিগন, ওয়াশিংটন এবং কানাডার জঙ্গল একদা বহু রহস্যে আবৃত ছিল। স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানরা 'সাস-কোয়াচ'এর গল্প করত। সাসকোয়াচ অর্থাৎ বিশাল পা, মানুষের পায়ের চেয়ে অনেক বড় হলেও পায়ের ছাপ মানুষের পায়ের মতো। তার পায়ের ছাপ তাকে দেখা যেত না। এ যেন হিমলেয়ের ইয়েতি। তবে জঙ্গলে যারা কাঠ কাটতে যেত তারা অনে-কেই হারিয়ে যেত। রেড ইণ্ডিয়ানরা বলত এসব হলো ঐ সাসকোয়াচের কাজ।

হাল আমলেও নাকি পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল কিন্তু সেই জীবকে কেউ দেখে নি। দেখেছিল একজন কাউবয়। সে তার ঘোড়ায় চেপে জঙ্গলের পথ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ে। এখানে জঙ্গল কিছু পরিষ্কার। কিন্তু সেই কাউ-বয় কি দেখল?

ঘোড়া কেন দাঁড়িয়ে পড়ল? আর এগোতে চাইছে না কেন? কাউবয় মুখ তুলে দেখল তার সামনে বিরাট এক নারীমূর্তি, উলঙ্গ, লোমে দেহ আবৃত কিন্তু বানরী নয় অথচ মানুষও নয়।

কাউবয়ের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে একটা মুভি ক্যামেরা ছিল। সে ভীত না হয়ে দ্রুত ক্যামেরা বার করে জীবটির ছবি তুলতে লাগল কিন্তু কয়েক ফুট তুলতে না তুলতে জীবটি তার দিকে চাইতে চাইতে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাউবয়ের তোলা সেই ছবি সারা আমেরিকায় দেখান হয়েছিল। কেউ বিশ্বাস করেছিল কেউ করে নি কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও লোমাবৃত উলঙ্গ সেই নারী-বানরীকে আর দেখা যায় নি।

নর্থ ক্যারোলিনার আরও একটি রহস্য এবং এটিও আলোর রহস্য। এই আলোর নাম ব্রাউন মাউনটেন লাইট। নর্থ ক্যারোলিনার একটি পার্বত্যময় অঞ্চলে এই আলো দেখা যায়।

সারা বছর দেখা গেলেও জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে এক পশলা বৃষ্টির পর আলো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়। কেউ কেউ বলেন পাহাড়ে কোথাও গ্যাস জমে সেই গ্যাসের সঙ্গে আকাশের বিদ্যুতের সংযোগে এই আলো জ্বলে ওঠে। ঐ পাহাড়ের কোথাও নিশ্চয় কোনো একটি ক্ষেত্রে কোনো কারণে নিরন্তর গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে।

এই আলোর একটা আকৃতি আছে। গোল বলের মতো, কখনও একটা দেখা যায়, কখনও একাধিক। আবার মজা আছে, কাছে গেলে দেখা যায় না।

স্থানীয় একজন লেখক বলেন যে গ্রহান্তরের জীব এসে ওখান থেকে আলোর সংকেত জানায়। তিনি আরও বলেন যে ঐখানে একটি বড় পর্বতগুহায় ফ্লাইংসসারের একটি শিবির আছে।

ওকলাহোমা, ক্যানসাস এবং মিজৌরি স্টেটের বর্ডারের কাছে নিওশো-এর সাতাশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে একটা জায়গাকে বলা হয় 'ডে ভলস প্রমিনেড।'

এখানেও একটি রাস্তার ওপরে একটি আলো বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়ায়। আলোটি মাঝে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় আবার মিলিত হয়। রাত্রির অন্ধকারে বহু মোটর আরোহী এই আলো দেখেছে। ফটোগ্রাফও তুলেছে। কেউ কেউ আলো লক্ষ্য করে বন্দুক থেকে গুলিও ছুঁড়েছে।

এই আলোর নাম 'হনেট ঘোস্ট লাইট'। প্রবাদ যে সদাবের রোধ এড়াতে এক জোড় তরুণ তরুণী আত্মহত্যা করেছিল। তাদের আত্মা আলো হয়ে ডেভিলস প্রমিনেডে বিচরণ করছে।

সাউথ ডাকোটা স্টেটে র‍্যাপিড সিটির কাছে 'কসমস অফ দি ব্ল্যাক হিল' নামে একটি জায়গা আছে। এই মাত্র ১৯৫২ সালে আবিষ্কৃত হলো যে ঐ জায়গায় স্থান বিশেষে দাঁড়ালে মানুষকে লম্বা বা বেঁটে দেখায়। শুধু মানুষ নয়, কোনো বস্তুকেও।

অরিগন স্টেটে গোল্ড হিল নামে একস্থানে 'অরিগন ভর্টেক্স'। এ নাম আমেরিকা-বাসীদের সুপরিচিত। এখানে গেলে আপনি দেখতে পাবেন গাছগুলি সব উত্তর দিকে ঝুঁকে আছে, আপনি প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়ালেও উত্তর দিকে ঝুঁকতে থাকবেন।

অরিগন ভর্টেক্স-এর একধারে বৃত্তাকার একটি জায়গা আছে। ঐ বৃত্তের ধারে একটি লোহার বল রেখে দিলে বলটি নিজেই গড়িয়ে গড়িয়ে ঐ বৃত্তের কেন্দ্রের কাছে চলে যাবে।

ঐ ভর্টেক্সের ব্যাস প্রায় পঞ্চান্ন মিটার। ভর্টেক্সের ভেতরে কম্পাস কাজ করে না!

এবার শুনুন বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের ভেতরে অন্য এক রহস্য, জাহাজ ডুবি বা বিমান নিরুদ্দেশ নয় অথচ ভৌতিক বা অলৌকিকও নয়। তবে কি উত্তর আমার জানা

নেই। কারও জানা আছে কি ?

রহস্যের আরম্ভ ১৮১২ সালের ৬ জুলাই তারিখ থেকে।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকাভুক্ত বারবেডস দ্বীপের দক্ষিণে ওইস্টিন শহরের ক্রাইস্ট চার্চ কবরখানায় রহস্যের সূত্রপাত।

এই কবরখানার এক অংশে পাথরের তৈরি একটি পারিবারিক ভল্ট ছিল। এইভল্টে টাকাকড়ি বা মূল্যবান সামগ্রী রাখা হতো না, রাখা হতো মৃতদেহ ভর্তি কফিন। ভল্টটি বেশ মজবুতভাবেই তৈরি, একটি মাত্র দরজা ছাড়া কোনো ফোকর বা ফুটোও ছিল না। দরজা অত্যন্ত মজবুত। বাইরে থেকে একটি মোটা মার্বেল পাথর দরজার ওপর রাখা থাকত। এমনি হেলিয়ে নয়, দরজাটিকে ঢেকে এবং চারিদিকে চুন বালি দিয়ে সিমেন্ট করে। তখনও আসল সিমেন্ট চালু হয় নি। ভল্টটির মাপ ছিল বারো ফুট বাই ছ'ফুট।

১৮০৭ সালের ৩১ জুলাই তারিখে মিসেস টমাসিনা গডার্ডের কফিন এই ভল্টে প্রথম রাখা হলো। এর পর ১৮০৮ সালের ২২ ফ্রেব্রুয়ারি তারিখে মেরি আন্না মেরিয় চেজ নামে একটি শিশুর কফিন রাখা হলো।

প্রতিবারই মার্বেল পাথরের গাঁথুনি ভেঙে পাথর সরিয়ে দরজা খোলা হয় এবং কফিন রাখার পর দরজা বন্ধ করে মার্বেল পাথরটি আবার গেঁথে দেওয়া হয়। ভুল হয় না।

এরপর চার বছর কেটে গেল। ভল্টের দরজা খোলার দরকার হয় নি। ১৮১২ সালের ৬ জুলাই তারিখে মেরি আন্না মেরিয়ার বোন ডরকাস চেজের কফিন বহন করে একটি ফিউনারেল পার্টি এসে ভল্টের সামনে দাড়াল। দু'জন লোক মার্বেল পাথরের গাঁথুনি ভেঙে দরজা খুলল। কফিন বাহকেরা মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকে চিৎকার করে উঠলো।

মিসেস টমাসিনা গডার্ডের কফিনটি কে দেওয়ালের দিকে বেঁকিয়ে সরিয়ে রেখেছে আর শিশু মেরি আন্না মেরিয়ার কফিনটি কে উলটো করে দাঁড করিয়ে দিয়েছে। মাথার দিক নিচে, পায়ের দিক ওপরে।

কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। কফিন দুটি যথাস্থানে আবার ঠিক করে রেখে এবং নতুন কফিনটিকেও যথাযথ ভাবে স্থাপন করে ভালো করে ভল্টের দরজা বন্ধ করে, পাথর মজবুত করে লাগিয়ে ফিউনারেল পার্টি চলে গেল।

ব্যাপারটি নিয়ে ছোট শহরে যথেষ্ট আলোচনা হলো কিন্তু কেউ কোনো কারণ বলতে পারল না।

প্রায় এক মাস পরে ৯ অগস্ট তারিখে মেরি এবং ডরকাসের বাবা টমাস চেজের কফিন আনা হলো। এবার কোনো গোলমাল দেখা গেল না।

এখন পাওয়া যাচ্ছে

চিরঞ্জীব সেনের বিজ্ঞানভিত্তিক সাড়া জাগানো

আরও কয়েকটি বই

কঙ্গোরিলা

ডেভিল ট্র্যাঙ্গল

লস্ট আটলান্টিস

পিরামিড রহস্য

প্ল্যানেট মিস্ট্রি

আবার বারমুডা ট্র্যাঙ্গল

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা